কাঙালী

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রূপা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই

রূপা মুদ্রণ
প্রথম সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৬০

প্রকাশক :
ডি, মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ ১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই ১

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক :
ফণিভূষণ রায়
প্রবর্তক প্রিন্টিং অ্যাণ্ড হাফটোন লিমিটেড
৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ১২

এই গ্রন্থে বিশেষত ১৯৪৭ পর্যন্ত বাঙালী জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মূল সূত্রগুলি প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। তাই অতিরিক্ত কথা সযত্নে বর্জন করে আমি রচনাটিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছি। মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করার বিশেষ চেষ্টা আমি করিনি। উপাদান ও উপকরণ শ্রদ্ধেয় অগ্রজদের সাধনার ফলেই আমি পেয়েছি। তথ্যের নির্বাচন, বিন্যাস ও ব্যাখ্যা আমার নিজস্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে পড়ছে। বাঙালীর ইতিহাসের প্রয়োজন তিনি বুঝেছিলেন; বাঙালীর আত্মবিস্মৃতির জন্য তিনি আক্ষেপও করেছিলেন। পণ্ডিতবৃন্দের চেষ্টায় সেই আত্মবিস্মৃতি খানিকটা ঘুচেছে বলে মনে হয়; এমনও মনে হয় আমরা প্রায় জাতিস্মর হয়ে উঠছি। তবে একটা কথা কিন্তু মনে রাখা উচিত। অতীত সম্বন্ধে অতিরিক্ত চেতনার বিপদ আছে। বর্তমানকে অস্বীকার করে ভবিষ্যৎকে গড়া যায় না আর ভবিষ্যৎ না থাকলে অতীতও নিরর্থক হয়ে পড়ে।

পরলোকগত পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশে গ্রন্থটি উৎসর্গিত হল।

সূচী

প্রথম পর্ব

রাষ্ট্র ও সম্পদ

দ্বিতীয় পর্ব

সমাজ ও সংস্কৃতি

তৃতীয় পর্ব

পরিশিষ্ট

প্রথম পর্ব

রাষ্ট্র ও সম্পদ

১ প্রাচীন যুগ

এক

ভারতের ইতিহাসের প্রথম দিকের পাতাগুলোয় বাংলার নাম অস্পষ্ট, বাঙালীর স্বাক্ষর নেই। প্রাক্-আর্য যুগে দ্রাবিড়, মোংগল, কোল প্রভৃতি জাতির মিলন-মিছিলে বাংলার কী সত্তা ছিল তা আজ আমাদের জানা নেই। শুধু অস্তিত্বের ইসারা মেলে কয়েকটা জায়গার নাম ও কয়েকটা প্রচলিত শব্দে।

অবশ্য মহাভারতে কয়েকবার বাংলার কথা আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তিনজন বাঙালী রাজা পাণিপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এঁদের বিরোধও হয়েছিল কিছু পরে; হয়তো সেইজন্যই এঁরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ নেন। কিন্তু যথেষ্ট পরাক্রম সত্ত্বেও এঁরা বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভারতের যুগে বাংলা দেশ কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কর্ণের অধিনায়কত্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার কয়েকটি অংশ বড়ো একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সিংহলের 'মহাবংশ' নামে পালি-গ্রন্থে বাঙালী বিজয়সিংহের লঙ্কা দ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায় কিন্তু তার ঐতিহাসিক ভিত্তি অটল নয়।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে আলেক্জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে বাঙালী রাজ্যের বিস্তার ছিল পঞ্জাব পর্যন্ত। আর এই রাজ্যের রণহস্তীর ভয়েই নাকি গ্রীক বীর ভারত ত্যাগ করেন। কিন্তু গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে বাঙালী গংগারিডি জাতির এই প্রশংসাটুকু ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্য আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। অবশ্য টলেমির বিবরণ থেকে জানি যে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্বাধীন বাঙালী রাজ্য ছিল আর ছিল তার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি। কিন্তু প্রায় ছ শো বছরের উত্থান-পতনের ধারায়, গ্রীক-শক-হূণ-

পল্লব জাতির অভিযানের প্লাবনে, আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের যুগ-বিপ্লবী পরিবর্তনে বাংলার চিহ্ন আর মেলে না। বাঙালীর ইতিহাসে এটি এক বিস্মৃত, লুপ্ত অধ্যায়।

বাঙালীকে আবার আমরা দেখলাম খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে গুপ্ত যুগে। গুপ্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময়ে বাংলায় ছিল কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য। সিংহবর্মা ও তাঁর ছেলে চন্দ্রবর্মা ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের স্বাধীন রাজা। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়াতে এঁদের প্রাচীন লিপি এখনো রয়েছে। দামোদর নদের দক্ষিণে পোখর্ণা গ্রামেই বোধহয় এঁদের রাজধানী ছিল। গুপ্তেরা বাংলাকে জয় করলেও সম্পূর্ণ অধিকারে আনতে পারেননি; খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভাবে বাংলায় স্বাধীনতা ছিল। গুপ্ত সম্রাটদের দুর্বলতার সময়ে একাধিক বাঙালী রাজা স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেন।

গৌড় অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে শশাঙ্কই বাঙালী রাজাদের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি হন আর তাঁর অধিনায়কতায় খণ্ড রাজ্যগুলি সম্মিলিত হয়। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ—মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাছেই। বাণভট্টের ও হুয়েন্-সাঙের নিন্দা সত্ত্বেও আর্যাবর্তে বাঙালীর রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও আংশিক সাফল্যের জন্য শশাঙ্কের নাম বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। কূটনীতি ও সামরিক শক্তির প্রয়োগে তিনি মৌখরিরাজ ও উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষবর্ধনের চেষ্টা ব্যর্থ করে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এক শো বছর কেটেছে আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে আর বহিঃশত্রুর আক্রমণে, অরাজকতায় আর মাৎস্যন্যায়ে; প্রবল করেছে অত্যাচার দুর্বলের ওপর, বড়ো মাছ খেয়েছে ছোট মাছকে। তারপর দীর্ঘকালের রক্তপাত আর শোষণ আনল গণতান্ত্রিক সমাজবোধ ও শান্তির জন্য স্বার্থত্যাগ। অষ্টম শতাব্দীর ভারতে এটি এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। দেশে নেতারা ও

জনসাধারণ সমস্ত বিরোধ বিসর্জন দিয়ে গোপালকে করলেন রাজপদে নির্বাচন আর এই শুভবুদ্ধি আনল বাংলায় এক অভাবনীয় যুগান্তর।

এবার শুরু হল প্রায় এক শো বছরের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ধর্মপালের সময়ে বাঙালীর রাজনীতির প্রতিষ্ঠার মূল কারণ হচ্ছে তার দ্রুতবর্ধমান আত্মশক্তিবোধ ও সেই শক্তিতে পূর্ণ আস্থা। এই নতুন জাতীয় জীবনই অনুপ্রাণিত করেছে ধর্মপালের সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা। গুর্জররাজ ও রাষ্ট্রকূটরাজের কাছে ব্যাহত হয়েও এই নতুন শক্তি নিরুদ্যম হয়নি। সারা আর্যাবর্তে বাঙালীর এই দৃঢ় প্রতাপের ইতিহাস আজ দিবাস্বপ্নের মতোই অনিশ্চিত বলে মনে হয়; শুধু কয়েকটা তাম্রশাসন, শিলালিপি ও তিব্বতী পুঁথির মধ্যে অতীতের সেই দুর্বার আশার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মেলে। দেবপালের সময়েও সাম্রাজ্যবিস্তার অক্ষুণ্ণ ছিল; উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে কাশ্মীর ও পূর্বে আসাম পর্যন্ত ছিল রাজ্যের সীমানা। কিন্তু তারপরেই আরম্ভ হয় অধঃপতন; গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রুর ধারাবাহিক আক্রমণে বিশাল সাম্রাজ্য ক্ষীণকায় হতে থাকে। বাংলা দেশে আবার খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়।

দশম শতাব্দীর শেষ দিকে মহীপালের আমলে পালগৌরব আবার ফিরে এল। কলচুরিরাজ ও চোলরাজের কাছে সাময়িক ভাবে পরাভূত হলেও মহীপাল রাজ্যবিস্তারে ক্ষান্ত হননি। কিন্তু তাঁর পরেই অধঃপতনের পুনরাবৃত্তি, গৃহবিবাদ আর বহিঃশত্রু, স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উৎপত্তি। অবশেষে বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহী সামন্তেরা কৈবর্তজাতীয় দিব্যকে রাজা করেন। দ্বিতীয় মহীপাল এই বিদ্রোহে নিহত হলেও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল পরে হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। বাংলার বাইরেও তাঁর প্রতিপত্তি স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাঁর পরে নেতৃত্বের অভাবে পালরাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলে এবং এর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে পালরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে উঠল সেনরাজ্য। সেনবংশীয়েরা সম্ভবত অবাঙালী ছিলেন—কর্ণাটী ব্রহ্মক্ষত্রিয়। হয়তো দাক্ষিণাত্যের কোনো অভিযানের সময়ে এঁরা এসেছিলেন এবং পরে পালেদের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা বিজয় সেন প্রায় গোটা বাংলাতেই আধিপত্য করেছিলেন। সেনবংশীয়েরাই পালযুগের শেষে অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায় থেকে বাঙালীকে রক্ষা করেন। বল্লাল সেনের কীর্তি সমাজসংস্কার ও মিথিলাজয়। শান্তি ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে বল্লাল সেন বাঁচালেন বাঙালীকে; কিন্তু তাঁর সমাজসংস্কার যে একদিন 'বল্লালী বালাই' হয়ে উঠবে তা কেউ বোঝেনি। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন প্রায় সারা জীবন ধরে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বাংলার সীমানা বিস্তার করেন—উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে মগধের খানিকটা। বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণ সেন যখন নবদ্বীপে অবস্থান করছিলেন তখনই তাঁর রাজ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হয়। সুন্দরবনের খাড়ী পরগণায় ডোম্মন পাল স্বাধীন খণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরাপথে সারা আর্যাবর্তে তখন চলছে যুগ-বিপর্যয়—মহম্মদ ঘোরীর বিজয় অভিযান। ঘোর দুর্যোগের সেই অন্ধকারময় দিনগুলোয় ইতিহাসের আলোড়নের কোনো বিবরণই আমরা পাই না।

নবদ্বীপ-বিজয় সম্বন্ধে মিনহাজ্‌উদ্দিনের যে সতেরো-ঘোড়-সওয়ারী কাহিনী প্রচলিত আছে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। 'মিনহাজ্‌ নিজেই লক্ষ্মণ সেনের শৌর্য ও শাসন-নৈপুণ্যের জন্য তাঁকে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে প্রশংসা করে আল্লার কাছে বিধর্মী 'লখ্‌মনিয়া'র লঘু শাস্তির জন্য আবেদন পেশ করেন। আসলে নদীয়া-বিজয় একটি অতর্কিত সামরিক চাল যার জন্য রাজপ্রাসাদে একটা তুমুল গণ্ডগোল হয় ও বৃদ্ধ রাজা পালাতে বাধ্য হন। ফলে শহরে যে বিশৃঙ্খলা হয়েছিল তারই সুযোগ নিয়ে

কিছু পরে আগত মুসলমান সেনা লুঠতরাজ করে। অপ্রস্তুত বৃদ্ধ রাজার পলায়ন কাপুরুষতা নির্দেশ করে না; ইতিহাসে এই রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। রক্ষীদের মূর্খতা বা নগরপালের বিশ্বাস-ঘাতকতাও এই ব্যাপারের জন্য দায়ী হয়ে থাকতে পারে।

১২০২ অব্দে নদীয়া আক্রমণের পরেও সেন বংশ রাজত্ব করেন কিন্তু এখন থেকেই আঞ্চলিক স্বাধীনতার সাড়া পড়ে যায় আর খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হতে থাকে। তা ছাড়া তুর্কী আক্রমণ তো ছিলই। স্বাধীন বাংলায় ভাঙন লাগে। পালসাম্রাজ্যের দুর্বলতার যুগে যেমন পূর্ববঙ্গে বর্ম রাজবংশের উৎপত্তি হয় তেমনি সেন রাজত্বের শেষ দিকে গজিয়ে ওঠে দেববংশ ও পট্টিকেরা রাজ্য। ঢাকা ও শ্রীহট্টের তাম্রশাসনে দেববংশের নাম পাওয়া যায়। পট্টিকেরা রাজ্য আরো পুরানো। ১৯৪৩ সালে সামরিক কারণে মাটি খুঁড়তে গিয়ে কুমিল্লায় ময়নামতী পাহাড়ের কাছে প্রায় দশ মাইল জায়গায় এই রাজ্যের বিশাল নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাংলায় ইসলামী শাসন স্থায়ী হয়ে বসতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টাও আংশিকভাবে একাধিক বার হয়েছিল।

হিন্দু মুসলমানদের মিশ্র শাসন ছিল এ যুগের মুখ্য রাজনীতি।

রাজ্যবিস্তারের যুগে বাঙালী ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। সীমানা-সঙ্কোচনের সময়ে তারা ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। বরেন্দ্রভূমির গদাধর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের অধীনে মাদ্রাজের বেলারি জেলায় কোলগল্লু গ্রামে তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। প্রায় ১২০০ সালে গাঢ়্‌ওয়াল্‌ অঞ্চলে বাঙালী অনেকমল্ল রাজত্ব করতেন। আবার পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর মাঝখানে পার্বত্য রাজ্যের স্থাপনা করেন সপ্তম শতাব্দীতে আর এক বাঙালী—তাঁর নাম ছিল শক্তি। পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে সুকেত, কাষ্টওয়ার, কেওন্থল ও মণ্ডি রাজ্যের রাজারা ছিলেন বাঙালী।

পাল ও সেন রাজ্যের সামরিক বিভাগ বা রণপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ না পেলেও মনে হয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত ব্যবস্থাই মোটামুটি ভাবে এখানে প্রচলিত ছিল। মহাসেনাপতির অধীনে থাকত পদাতিক, হাতি, উট, ঘোড়া ও নৌবাহিনী। বাঙালীর নৌশক্তি যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সেকথা কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। হস্তিবাহিনীর প্রসিদ্ধি গ্রীক অভিযানের সময় থেকেই ছিল। ঘোড়া আনতে হত অবশ্য কম্বোজ থেকে। যুদ্ধরথের প্রচলন ছিল, তবে খুব বেশী ব্যবহার হত বলে মনে হয় না। সৈন্যবাহিনীতে অবাঙালীকেও প্রয়োজন মতো নেওয়া হত।

হাজার বছরের প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রধারা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি তথ্য মেলে।

ভারতের ইতিহাসে বাঙালী মোটেই অপরিচিত ছিল না; বরং অনেক সময়েই সে বেশ একটি উল্লেখযোগ্য অংশই গ্রহণ করেছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস শুধু অবাঙালীর ইতিহাস নয়। বাংলার সীমান্ত পার হয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করা ও তাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া বাঙালীর পক্ষে একাধিক বার সম্ভব হয়েছিল আর সে সাম্রাজ্যের গৌরব কোনো অবাঙালী রাজ্যের গৌরবের চেয়ে কম ছিল না। বাঙালীর রাষ্ট্রনীতিক ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চল; বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তার জীবন গড়ে উঠেছে। তার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চেতনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে মাৎস্যন্যায়ের যুগে গোপালকে রাজপদে বরণ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ বাঙালীকে বার বার ব্যস্ত করেছিল। কিন্তু তা হলেও স্বাধীনতার দৃঢ় কামনা আত্মপ্রকাশ করেছে নানা ভাবে। অখণ্ড বাঙালী রাজ্যের চেষ্টা কখনো খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। স্থানীয় নেতাদের মধ্যে ঐক্যের অভাবে প্রায় প্রত্যেক যুগেই রাষ্ট্রজীবন বিপন্ন হয়েছে। আঞ্চলিক স্বাধীনতা আর অন্তর্দ্বন্দ্ব অপরিমেয় সম্ভাবনাকে আহত করেছে বার বার।

অনার্য ধর্ম, হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধ ধর্ম—একটার পর একটা ধর্মের স্রোতে বাংলার রাষ্ট্রনীতি বিশেষ কিছুই পরিবর্তিত হয়নি অর্থাৎ ধর্মের গোঁড়ামি রাজনীতিকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করতে পারেনি।

দুই

প্রাচীন যুগে অবশ্যই বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। ধানই ছিল প্রধান শস্য আর কৃষিপ্রণালীও ছিল মোটামুটি এখনকার মতোই। চাষীদের সঙ্গে রাজা বা সামন্ত রাজাদের ঠিক কী রকম সম্পর্ক ছিল বলা কঠিন; তবে বোঝা যায় যে অর্থাবস্থার দায়িত্ব নিশ্চয় ছিল সামন্তদের ওপরে এবং পঞ্চায়েতী পদ্ধতির সঙ্গেও এর সম্পর্ক ছিল। ধান ছাড়াও তুলো, সরষে, আখ ও নানা রকম ফলের চাষ ছিল, আর মাছ তো নদীতে ছিলই। ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আরো কয়েকটি ব্যাপারে নিষ্কর ভূমি দেবার ব্যবস্থা করা হত।

শিল্প প্রধানত 'কুটিরজাত' শ্রেণীরই ছিল। বৃহৎ শ্রমশিল্পের সম্ভাবনা থাকতেই পারে না। বাঙালীর বস্ত্রশিল্প শুধু মধ্য যুগে নয় প্রাচীন যুগেও ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধ ছিল। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে আমরা জানতে পারি যে বাঙালা অতি প্রাচীন কাল থেকেই রেশমের চাষ ও বয়ন ভালো করেই জানত। ধাতু ও প্রস্তর শিল্পের উন্নতির বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। জলপথের আধিক্য থাকায় বাঙালীকে ভালো নৌশিল্প গড়ে তুলতে হয়েছিল। বাঙালী নৌবাহিনীর কথা কালিদাসও উল্লেখ করেছেন।* খালিমপুর তাম্র-শাসনে ধর্মপালের নৌবাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। নানা রকম সওদা-গরি নৌকার উল্লেখও পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙালী কারুকারেরা গোষ্ঠী বা সংঘ গঠন করত নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও শিল্পোৎকর্ষের জন্য; এই বিভিন্ন শিল্পিসংঘগুলিই বৃত্তি-সম্প্রদায় থেকে পরে নানা জাতিতে পরিণত হয়।

বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেছিল বাংলার নদী ও সমুদ্রতীর। নদী ও সমুদ্রের ধারে ধারে তাই অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রাম, হাট, গঞ্জ ও শহর গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে এক গ্রীক নাবিকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গঙ্গার মোহনায় গঙ্গে নামে এক বন্দর ছিল। এখান থেকে দক্ষিণ ভারত, সিংহল, বা দূর প্রাচ্যের মালয়, জাভা ইত্যাদি দেশে বাঙালীর বাণিজ্য চলত। পরে তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত বা তমলুকই প্রধান বন্দর হয়ে উঠে। স্থলপথে ব্রহ্ম, আসাম, চীন, নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য ছিল। বাঙালীর অর্থনীতিজাত ঘনিষ্ঠতা এই ভাবে প্রাচ্যের অনেক দেশেই স্থাপিত হয় এবং বাণিজ্যের সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতিও নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তার নিদর্শন আজো মেলে। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ন্ তাম্রলিপ্তের অর্থ ও সমৃদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করেন। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে ই-চিঙের আগমনের সময়ে সমুদ্রের মোহনার অবনতির জন্য তাম্রলিপ্ত সরে গিয়েছিল জলরেখা থেকে, আর তার পরেই সেই বিরাট বন্দরের অধোগতি শুরু হয়।

এক

লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় নানা কারণে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মুসলমানেরা যে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আধিপত্য স্থাপন করেছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এর কারণ কী? বাঙালী হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে তখন শৌর্যবীর্য বলতে কিছুই ছিল না এমন নয়। তাদের বীরত্বের প্রমাণ সারা মধ্য যুগেই ছড়ানো রয়েছে। মধ্য যুগে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে অনেক কম ছিল; সুতরাং সে যুগের গণবীর্যের দাবি হিন্দুরাই করতে পারে, যদিও সামরিক নেতৃত্ব মুসলমানেরই বেশী।

হিন্দু রাজত্বের পতনের প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সেই কারণে নেতৃত্ব ও সংঘশক্তির অভাব। তাছাড়া গতানুগতিক রণপদ্ধতির কালানুযায়ী কোনো পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের নানাবিধ বিকৃতিও বাংলার সমাজজীবনকে দুর্বল করে ফেলেছিল, আর তথাকথিত আধ্যাত্মিক চর্চার আধিক্যে দেশের বাহুবলও অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। মুসলিম অভিযানকে তাই নেতৃত্বহীন, বিক্ষিপ্ত ও বিহ্বল জনসাধারণ নিজেদেরই পাপের ফল ও ঈশ্বরের অমোঘ বিধান বলে স্বীকার করে নিয়ে মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। বল্লালী নিয়ম বা আদিশূরী নীতি যে অবাঙালী পন্থা নির্দেশ করেছিল তাতে হিন্দুদের মধ্যে জাতিবিরোধ ও হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষও খানিকটা হয়েছিল; ফলে প্রতিরোধশক্তি আরো কমে গেল। বাংলায় উচ্চবর্ণের সংখ্যাল্পতা থেকেই বোঝা যায় যে জাতের বালাই আগে বিশেষ ছিল না; এটা অবাঙালী সেন রাজা ও কনৌজী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণ-শ্রেণী থেকেই বোঝা যায় এ দেশে প্রাচীন যুগের শেষেও বাঙালী ব্রাহ্মণ সংখ্যায় কতো

কম ছিল। যাই হোক, এই কৃত্রিম শ্রেণীবিরোধের সঙ্গে আবার ভাবতে হবে সেনযুগের শেষ দিকে নৈতিক অধঃপতন ও বিলাসিতার কথা। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, সেনংবশের কেশব কৌমার্যে শক্তিচর্চা করলেও বখতিয়ারের সময়ে তিনি হয়তো সুন্দরীদের দলে আদিরসাত্মক উদ্ভট শ্লোকের তাৎপর্য-উপলব্ধিতেই ব্যস্ত ছিলেন। নানা কারণে মানস ক্ষেত্র আগে থেকেই কুসংস্কারী ধর্মোপদেশের মধ্য দিয়ে কল্কি অবতারের জন্য প্রস্তুত ছিল, আর তাই নির্বীর্য ধর্ম-ও-সমাজ-নেতারা সহজেই নিরক্ষর লোককে বোঝালেন :

ধর্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কালো টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান···
ব্রহ্মা হৈলা মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম···
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তেঁই হইল হায়া বিবি···
—রামাই পণ্ডিত : শূন্য পুরাণ

প্রাচীন যুগের অবসানের সময়ে বাংলার অবস্থা ছিল এই। অপর দিকে মধ্য প্রাচ্যের মরুভূমির দুর্ধর্ষ বর্বর সন্তানেরা জগজ্জয়ে বেরিয়ে পড়েছিল নবলব্ধ ইসলামী ধর্মের প্রেরণায়। লুণ্ঠন, আধিপত্য ও ধর্মপ্রচার—এই ছিল তাদের অভিযানের নীতি। বৌদ্ধ-বিহার বা হিন্দু-মন্দির ধ্বংসের কারণ শুধু ধর্মবিদ্বেষ নয়, জাতির মর্মস্থানে আঘাত করে বিহ্বল ও নিরাশ করে দেওয়া। ধন-সম্পত্তির লোভ তো ছিলই, বিশেষত এই ধর্মকেন্দ্রগুলিই যখন হয়ে উঠেছিল ধনাগার। তা ছাড়া মৃত্যুর অন্ধকারও দূর হয়েছিল এক পরম-লোভনীয় বেহেস্তের আলোয়। অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিরা তাই তাদের শান্তিপ্রিয়তা ও সংস্কৃতির ফলে এই দুর্বার ও উন্মত্ত বাহুবলকে অনেক ক্ষেত্রেই রোধ করতে পারেনি।

মধ্য যুগের প্রায় চার শো বছর পাঠানী আমল বলে অভিহিত হলেও শাসক-সম্প্রদায় সব সময়েই 'পাঠান' ছিলেন না—কখনো আরবী, আবিসিনীয় ('হাবসী'), খোজা, কখনো বা হিন্দু। পাঠান আমলে প্রায় কোনো কালেই সমগ্র বাংলায় মুসলমান শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না, প্রত্যন্ত অঞ্চলে তো নয়ই। হিন্দু জমিদার ও সামন্তেরা যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতেন। স্বায়ত্ত-শাসনও সর্বত্র প্রচলিত ছিল। পাঠানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হিন্দুবিদ্রোহ এ যুগের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ধারা, কিন্তু প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সমগ্র বাংলার দিল্লি থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার চেষ্টা। সে চেষ্টা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে সমভাবেই প্রবল ছিল। মোগলেরা তাই প্রথম থেকেই বাংলার এই দিল্লি-বিরোধিতা নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। বাংলার কাছে 'দিল্লি অনেক দূর'।

চার শো বছরের পাঠানী আমল কয়েকটি ব্যক্তি ও বংশের দ্রুত উত্থান-পতনের ইতিহাস। প্রথম দিকে বাংলা মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং স্থানীয় কর্তারা বিদ্রোহ ও সংঘর্ষের মধ্যেই বছর কাটিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে দিল্লির সুলতান বিদ্রোহ দমন করে শাসনকর্তা বদলে দিতেন, কিন্তু শেষ দিকে প্রায় দু শো বছর বাংলার শাসনকর্তারা স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ ইলিয়াস্ শাহী রাজত্ব। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বাধীন হিন্দু রাজা গণেশের আবির্ভাব। তাঁর পুত্র যদু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দীন নামে রাজত্ব করেন। সমসাময়িক স্বাধীন হিন্দু রাজা দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের নামও পাওয়া যায়, তবে এঁদের সম্বন্ধে ইতিহাস স্পষ্ট কিছুই বলে না। জালালের পরে রাজত্ব করেন নসিরুদ্দিন শাহ ও তাঁর দুই ছেলে, কিন্তু তারপরেই আবার দ্রুত পরিবর্তনের স্রোতে অনেকের আবির্ভাব ও তিরোভাব।

১৪৯৩ থেকে ১৫১১ পর্যন্ত হোসেন শাহের রাজত্বই বাংলায়

পাঠানী আমলের 'স্বর্ণযুগ'। হোসেন হাবসী ও নিগ্রোজাতীয় মুসলমানদের প্রভাব বাংলায় নষ্ট করে দেন। উড়িষ্যালুণ্ঠন আর ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে বিরোধ ছাড়া তাঁর রাজ্যে সামরিক ব্যাপার বিশেষ কিছু হয়নি। এঁর রাজসভার পোষকতায় এবং শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙালী সংস্কৃতি বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। হোসেনী বংশের পরে উল্লেখযোগ্য পাঠান শের শাহ। বাংলা ও বিহারের আধিপত্য থেকে ইনি দিল্লির সিংহাসনে উঠেছিলেন। তখনকার ভারতে শের শাহের মতো প্রতিভাবান ও পরাক্রান্ত নেতা আর কেউ ছিলেন না। বাংলা দেশে উন্নত শাসনপ্রণালী প্রবর্তন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। কিন্তু তাঁর পরেই আবার শুরু হল দ্রুত পরিবর্তন। বোধ হয় জালাল শাহের সময়েই আবির্ভাব কুখ্যাত কালাপাহাড়ের। এই ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণসন্তান ১১ বছর সারা পূর্ব-ভারতে হিন্দুত্বের ধ্বংসব্রতে একটা দুর্যোগের মতো ঘুরেছেন।

প্রভুত্বের দাবি নিয়ে মোগল-পাঠানের বিরোধ চলেছিল অনেকদিন; এর সমাপ্তি হল দায়ুদ খাঁর মৃত্যুতে (১৫৭৬)। চার শো বছরের পাঠানী আমল শেষ হল, শুরু হল মোগল যুগ। কিন্তু সমগ্র বাংলায় মোগল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছিল বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের তীব্র প্রতিরোধের জন্য। মোগল আমলে সারা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা হয় দিল্লিতে। এতে বাংলার প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক গণ্ডীর সংকীর্ণতা অনেকটা গেল বটে, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন শোষণে পরিণত হতে লাগল। মোগল সুবাদারদের সময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজস্বের দিল্লিযাত্রায় দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। পোর্তুগীজ ও মগেদের অত্যাচারও বাংলার পক্ষে ক্ষতিকর হয়। পরে ইসলাম খাঁ ও কাশিম খাঁ অনেক কষ্টে এদের নির্মূল করেন। আর এক ঘটনা: সাজাহানের সময়ে ইংরেজ বণিকের আবির্ভাব।

আওরংজেবের রাজত্বে শায়েস্তা খাঁ হুগলি থেকে ইংরেজকে দূর করে দেন, কিন্তু পরে আবার ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়।

আওরংজেবের রাজত্বের শেষ দিকে বাংলায় জবরদস্ত সুবাদার হন ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণসন্তান মুর্শিদকুলি খাঁ। রাজস্বের জন্য ও অন্যান্য ব্যাপারেও ইনি হিন্দুদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করতেন। সরফরাজ ছিলেন যেমন বিলাসী তেমনি দুশ্চরিত্র; শোনা যায় তাঁর হারেমে নাকি হাজারখানেক নারীর বসতি ছিল। এই সরফরাজকে হত্যা করেই আলিবর্দি নবাব হয়ে প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। অনেক দিন পরে একজন যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব হল। কিন্তু উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি বারবার মারাঠী বর্গির উৎপাতে বিব্রত হয়েছিলেন।

এই জনপ্রিয় নবাবের দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। ১৯ বছর বয়সে নবাব হয়ে সিরাজ মাত্র চার মাস রাজত্ব করেছিলেন। অতিরিক্ত আদরে সিরাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটে। দোষ ছিল তাঁর অনেক, যদিও তাঁর সম্বন্ধে কুৎসা-কাহিনীর সবগুলো সত্য নয়। তবে আলিবর্দির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, হোসেন কুলি খাঁর হত্যা, নিজের মাসী ঘসেটি বেগমের সম্পত্তিলুণ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপার ঐতিহাসিক। শোনা যায় তিনি নাকি নারীর ছদ্মবেশে জগৎ শেঠের অন্দরে ঢুকেছিলেন; রাণী ভবানীর মেয়ে তারাসুন্দরীর ওপরও তাঁর নাকি নজর ছিল। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে অত্যাচারী, দুশ্চরিত্র, বিলাসী ও রূঢ় জমিদার বা নবাব তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বহু ছিলেন। এটা সনাতন ব্যাপার, সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য নয়। 'বঙ্গ-গৌরব' প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও অনেক লজ্জাকর কাহিনী প্রচলিত আছে। সিরাজের চরিত্রে কলঙ্কলেপনের জন্য ইংরেজও যে খানিকটা দায়ী তা 'অন্ধকূপ হত্যা' র মিথ্যা বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। তবে সিরাজ যে জনপ্রিয় ছিলেন না তাও স্পষ্ট বোঝা যায়। মীরজাফর বা জগৎ শেঠের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বাদ দিলেও দেখি পরাজয়ের পর

নিরাশ্রয়, উপবাসী নবাবকে ধরিয়ে দিয়েছে ফকির দানা শা। তারপর মীরনের নিষ্ঠুর আদেশ, মহম্মদী বেগের পাশবিক আঘাত। হাতীর পিঠে মৃত নবাবের ছিন্ন দেহ পথে পথে ঘুরেছে, রক্ত ঝরেছে। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ, কোনো আন্দোলন বা চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। মীরমদন ও মোহনলাল প্রাণ দিয়েছিল দেশের জন্য, সিরাজের জন্য নয়। তাঁর দেশপ্রেম ছিল, ইংরেজের প্রভুত্ব তাঁর সহ্য হয়নি—এ কথা ঠিক। কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে ভালো-মন্দ মিশিয়ে সিরাজ ছিলেন তখনকার দিনের একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। মধ্য যুগের অন্য অনেক যুদ্ধবিগ্রহের মতোই পলাশীর যুদ্ধকে আমরা ভুলে যেতাম, আর সিরাজকেও; ভুলিনি, কারণ এখানে দেখি বিদেশী শক্তির সঙ্গে প্রভুত্বের লড়াই আর বাংলার তথা ভারতের শোচনীয় পরাজয়। দু শো বছরের ইংরেজী শাসনই দিয়েছে সিরাজ আর পলাশীকে এক অপরিমেয় ঐতিহাসিক মূল্য।

কিন্তু সিরাজের পরেই ইংরেজী প্রভুত্ব আরব্ধ হয়ে যায়নি। মীরজাফরের কথা বাদ দিলেও মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষ মনে রাখতে হবে। ১৭৬৫ সালেও সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ক্লাইভ্‌কে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি নিতে হয়েছিল। এই সময় থেকেই বাংলায় ইংরেজী আমলের শুরু হয়।

পাঠান এমন কি মোগল যুগেও বিভিন্ন সময়ে শক্তিশালী জমিদারেরা বিদ্রোহ করে আঞ্চলিক স্বাধীনতা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে 'বারভুঁইয়া'-শ্রেণীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বারোজন সামন্ত রাজা নিয়ে মণ্ডল-রচনার প্রথা হিন্দু যুগেও ছিল; 'বারভুঁঞা বসে আছে বুকে দিয়ে ঢাল' (মাণিক গাঙ্গুলির 'ধর্মমঙ্গল কাব্য')। মোগল-পাঠান বিরোধের সময়েও বৈদেশিক লেখকেরা এই রীতি লক্ষ্য করে বলেছেন যে তখন বারোজনের মধ্যে তিনজন ছিলেন হিন্দু ও তাঁদের আধিপত্য ছিল শ্রীপুর, চন্দ্রদ্বীপ ও সুন্দরবন অঞ্চলে। সোনার গাঁ-র ঈশা খাঁ ছিলেন হিন্দুবংশজাত। তিনি বিশেষ

শক্তিশালী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শ্রীপুরের চাঁদ ও কেদারের সঙ্গে বিরোধ ছিল তাঁর—শোনা যায়, নারীঘটিত ব্যাপারের জন্য। শ্রীপুরের কীর্তি ধ্বংস করেই পদ্মা নদী হয়েছে 'কীর্তিনাশা'। যশোরের প্রতাপাদিত্য ছিলেন আর এক দুর্দান্ত ভুঁইয়া; মানসিংহের হাতে এঁর ধ্বংস হয়। আর এক ক্ষমতাশালী জমিদার চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র। ভূষণা বা ফরিদপুরের মুকুন্দরাম প্রায় সারা জীবন মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে গেছেন; এঁর পুত্র সত্রাজিৎও মোগলদের যথেষ্ট অশান্তি দিয়েছিলেন। আর এক বিদ্রোহী ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য। এঁরা সকলেই দিল্লি-অধিকৃত বাংলাতে থেকেই বিদ্রোহের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মোগল-পাঠান আমলে বাংলার প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতে মুসলমান শাসন স্থায়ীভাবে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বন-বিষ্ণুপুর এই সুযোগে স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সব বিদ্রোহীরা কখনও একযোগে দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করেননি।

মুসলমানী আমলে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—বিদেশী বণিকের আবির্ভাব ও অত্যাচার। পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ এদেশে আসে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রভুত্বের ব্যবস্থা করে। পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজেরা শক্তিহীন হয়ে পড়লেও সংঘর্ষ চলে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে। সিরাজকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন ক্লাইভের বিরুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি। পোর্তুগীজেরা দস্যুবৃত্তি পছন্দ করত বেশী আর তাদের জলযুদ্ধের নৈপুণ্য বাংলার সমুদ্রতীরে ও অসংখ্য নদীতে বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়। এরা বাঙালীর বাণিজ্য নষ্ট করে দেয় আর এদের অত্যাচারে বর্ধিষ্ণু সুন্দরবন অঞ্চল জঙ্গলে পরিণত হয়। কার্ভালো ও গঞ্জালেস্ প্রভৃতি দলপতিদের অত্যাচারে বাংলার হিন্দু-মুসলমান বিধ্বস্ত হতে থাকে। লুণ্ঠন, নারীহরণ, ধর্মান্তরীকরণ, দাসত্ব ইত্যাদি নানাভাবে বাঙালী এদের কাছে লাঞ্ছিত হয়। অথচ বাংলার

বিদ্রোহী জমিদারেরা অনেক সময়েই এদের সাহায্য নিয়েছেন। ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে আরাকানী মগদের মাঝে মাঝে বিরোধিতা হলেও অনেক সময়েই এরা যুক্ত হয়ে বাংলায় অত্যাচার করেছে। মগদের উৎপাতও যে কতো ভয়ংকর হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে 'মগের মুলুক' কথার ব্যবহার থেকে। মগ-ফিরিঙ্গিরা সাধারণের কাছে 'হার্মাদ' ('আর্মাডা' থেকে) নামেই পরিচিত ছিল। কবিকঙ্কণ বাঙালী সওদাগরের নৌযাত্রা সম্বন্ধে বলেন:

ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে;
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে।

ইসলাম খাঁ ও শায়েস্তা খাঁর আমলে সতেরো শতকের শেষার্ধে এদের দমন ঘটে। মগেরা পলায়নের ('মগ-ধাওনিং) সময়ে চট্টগ্রাম জেলায় ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে তাদের বুদ্ধবিগ্রহ ও ধনরত্ন মাটির তলায় রেখে গিয়েছিল; আজো নাকি তাদের পুরোহিতেরা সেই ধনরত্নের সন্ধান করেন। মোগল আমলের শেষ দিকে বাংলায় শুরু হল আর এক উৎপাত—বর্গির হাঙ্গামা। ভাস্কর পণ্ডিত, রঘুজী ও বালাজীর অত্যাচারে আলিবর্দি বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন; অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর একটা মীমাংসা হয়।

দুই

বাংলা: খৃঃ অঃ ১৬৩২। বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, সন্দ্বীপ, খুলনা, সুন্দরবন, হুগলি। হার্মাদ পোর্তুগীজ সতেরো শতকের বাংলার বিভীষিকা। লুঠতরাজ, আগুন, নারীহরণ, দাসব্যবসায়, হত্যাকাণ্ড, ধর্মান্তরীকরণ। আর ফিরিঙ্গির সঙ্গে জুটলো মগ, যেন—সারা বাংলাদেশটা হল তাদেরই মুলুক। সমুদ্রতীর ও নদীর দুধারে বসতি জনশূন্য, নৌকা চলে না ফিরিঙ্গির ভয়ে। এদের পাদ্রিরা

চাকার তলায় পিষে বন্দীদের বিকলাঙ্গ করে দিত, লোহার শিক পুড়িয়ে চোখ অন্ধ করত—বাধ্য হয়ে শত শত লোক হত ক্রিশ্চান। এই সব বোম্বেটেরা সময়ে সময়ে দেশী রাজাদের ফৌজে চাকরি নিয়ে দল বেঁধে বাস করত হিজলি, শ্রীপুর, ভুলুয়া, বাকলা প্রভৃতি জায়গায়। জঘন্য ব্যভিচারের জীবন ছিল এদের। সন্দীপের বোম্বেটে রাজা গঞ্জালেস ও দুর্দান্ত পাদ্রি আলভারেজের কুখ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

এদেশী মেয়ে বিয়ে করে পোর্তুগীজরা বসতি শুরু করল। গড়ে উঠল তাদের আলাদা সমাজ, আলাদা আদব কায়দা। শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না এদের গার্হস্থ্য জীবনেও। ঢিলে রেশমী পোশাক গায়ে, পিছনে নফরের হাতে ছাতা, কোমরে তলোয়ার। মৌজের দিকে নজর ছিল বেশ—গান, বাজনা আর জুয়ার হল্লা। মেয়েদের মধ্যে ছিল পর্দার কড়াকড়ি। বাড়ীর বাইরে তাদের যেতে হত কাপড় ঢাকা পালকিতে। বাইরের সাজ মখমল, কিংখাব বা রেশম; বাড়ীর পোশাক পাতলা সেমিজ আর রঙীন ওড়না। পুকুরে সাঁতার কেটে স্নানের পরে গায়ে চন্দন মেখে ঘি-ভাতের সঙ্গে নোনা মাছ খেয়ে পান চিবিয়ে দিন কাটাত তারা। স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না —ধুতুরার বিষ খাইয়ে স্বামীকে পাগল করার অভ্যাস ছিল তাদের!

ফিরিঙ্গিদের নানারকম ষড়যন্ত্রে ও শয়তানিতে মোগল সম্রাট বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ছোট ছেলে মুরাদের জন্মের সময়ে মমতাজ ছিলেন রোটাস্ দুর্গে। ফিরিঙ্গিরা পাটনা থেকে তাঁর দুই অনুচরীকে ধরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য কুৎসিত অত্যাচার করে তাদের ওপর।

কাশিম খাঁ এলেন ফিরিঙ্গির ঘাঁটি হুগলির দুর্গ দখল করতে ১৬৩২ সালের জুন মাসে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেও হাওয়া ছিল বেজায় গরম। পোর্তুগীজদের দুর্গে তাদের নিশান উড়ছে। আক্রমণের সংবাদ পেয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে তারা। কাশিম খাঁ তো চতুর লোক। তিনি বুঝলেন অবরোধ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ—

যাতে ফিরিঙ্গিরা নদীপথে সমুদ্রে না সরে পড়ে। জলপথে তাদের কাছে সাহায্য আসাও বন্ধ করতে হবে।

তিন দিক থেকে অবরোধ করা হল। শ্রীপুর থেকে বিরাট নৌবহর এল কলকাতার দশ মাইল দূরে শাঁকরাইলে। হিজলির পথ দিয়ে এল অশ্বারোহী আর পদাতিক সেনা। মথসুদাবাদ ঘুরে আর এক বাহিনী এসে যোগ দিল সাতগাঁ আর হুগলির মাঝামাঝি হলদিপুরে। গঙ্গার দুধারে মাইলের পর মাইল কামান পাতবার ব্যবস্থা হল হুগলি থেকে বেতড় পর্যন্ত। ২০শে জুন থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবরোধ আর যুদ্ধ চলল।

মোগলরা কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। ২২শে জুন হুগলির আশেপাশে জায়গা গুলো দখল করল তারা। মাত্র তিনশো ফিরিঙ্গির অধীনে ক্রিশ্চান নফর আর বাঙালী মাঝি-মাল্লারা বেশ বেগ দিল। মানোয়েল আজেভেদো ছিল এদের কাপ্তেন। মোগলদের জঙ্গলের আড়াল থেকে বন্দুক ছুঁড়ে ফিরিঙ্গিরা মোগল বাহিনীর বিরাট লোকক্ষয় ঘটাল।

কিন্তু হুগলির ফিরিঙ্গি বেণে-নাগরিকরা গৃহবিবাদ শুরু করল সন্ধির জন্য। তখন কাশিম খাঁর দাবি মেটানো কঠিন হয়ে পড়ল। তখন আবার যুদ্ধ শুরু হল। মোগলের কামানে হুগলির আশেপাশে বাস করা কঠিন হল। বালি অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল ফিরিঙ্গিরা।

অগষ্ট মাসে ঢাকা থেকে এল এক বিশ্বাসঘাতক ফিরিঙ্গি, মার্টিন আফোনৃজো দে মেলো, তার জাহাজ আর দলবল নিয়ে। এরই পরামর্শে আর বুদ্ধিতে মোগলরা যুদ্ধ চালাল। অবরুদ্ধ বন্দর আর দুর্গ রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে দেখে রাত্রের অন্ধকারে নিঃশব্দে কোশা ছিপ আর ঘুরাবিতে গিয়ে উঠল দলে দলে ফিরিঙ্গি। তাদের সেই জলযাত্রাই হল মর্মান্তিক। দে মেলোর তত্ত্বাবধানে মোগলের কামান ডুবিয়ে দিল বহু নৌকা। বারুদের স্তূপে আগুন

লেগে জ্বলে গেল ফিরিঙ্গির জাহাজ। বেতড়ের কাছে শেষ যুদ্ধ করে কিছু পোর্তুগীজ পালিয়ে গেল সাগর দ্বীপে।

বহু ফিরিঙ্গি বন্দী হল মোগলদের হাতে। তাদের মধ্যে অভিজাত পরিবারের সুন্দরী নারী ছিল অনেক। তারা গেল আগ্রায় বাদশাহের হারেমে। যে পোর্তুগীজ পুরুষরা মুসলমান হল বেঁচে গেল তারা; যারা হল না তারা রইল সারা জীবন কারাগারে দারুণ অত্যাচারের মধ্যে। শেষ বন্দী পাদ্রি আল্‌ভারেজ তাজমহল নির্মাণের কাজে মজুর হয়েছিল।

এক অন্ধ আংরেজ বণিক শেষ সর্বনাশ ঘটাল পোর্তুগীজদের। ফিরিঙ্গি পাদ্রির অত্যাচারে গোয়ায় তার চোখ দুটি নষ্ট হয়ে যায়। সাতগাঁ থেকে নৌকায় ছুটে এসে সে নিল প্রতিশোধ। সুড়ঙ্গ কেটে বারুদ দিয়ে দুর্গপ্রাকার ধ্বংসের কায়দা সে ফরাসী দেশে শিখেছিল। দুর্গের কাছে গির্জার নীচে সুড়ঙ্গ কাটল সে, হাজার মণ বারুদ ভরল সেখানে। কিন্তু সুড়ঙ্গে ঢুকে বারুদে আগুন দিতে কেউ সাহস পেল না।

তখন এগিয়ে এল এক গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার আহদী সৈনিক। সুড়ঙ্গে ঢুকে গিয়ে সে বারুদে আগুন লাগাল। গির্জা ও দুর্গপ্রাচীরের বিরাট ধ্বংসস্তূপে তার মৃতদেহ কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে ছিল এক হিন্দু ব্রাহ্মণ। খড়দহের গঙ্গার ঘাট থেকে মকরসংক্রান্তির স্নানের দিনে তার স্ত্রী আর ছোট বোনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বোম্বেটে ফিরিঙ্গি গঞ্জালেস্। চৌদ্দ বছর প্রতিহিংসার ব্রত সন্ন্যাসীর বেশে বহন করে হুগলির দুর্গ ভাঙল এই অত্যাচারিত বাঙালী ব্রাহ্মণ।

তিন

মধ্যযুগে যুদ্ধব্যবস্থা ছিল চতুরঙ্গের—পদাতিক, গজ, অশ্ব, নৌশক্তি। পশ্চিম বঙ্গে শেষেরটির বিশেষ প্রয়োজন হত না

জলপথের অভাবে। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে নৌবাহিনীর বিশেষ চলন ছিল। ভুঁইয়াদের অধীন পোর্তুগীজদের ওপরে অনেক সময়ে নৌবাহিনী চালনার ভার থাকত। আবার কখনো কখনো পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে, বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলে, নৌশক্তি গঠন করতেন 'বহরদার' বাঙালী হিন্দু-মুসলমান। 'নুরন্নেহা ও কবর' নামক পূর্ববঙ্গ গাথায় জাহাজের বহর কী ভাবে যুদ্ধ করত তার বিবরণ আছে। মুসলমানেরা কোরাণবাহী জাহাজকে অগ্রগামী করে অভিযান শুরু করতেন; পিছনের জাহাজে থাকত কামান ইত্যাদি। 'শ্লুপ্' বহরই বেশী চলত; শ্লুপ্ নৌকা প্রায় বালাম্ নৌকারই মতো; আকার ও নামের পরিবর্তন পোর্তুগীজ প্রভাবে। ষোলো বা তারও বেশী দাঁড়ের এই নৌকাগুলি বিশেষ ক্ষিপ্রগতি ছিল। প্রতিহার, আগরি, গোয়ালা, বাগদি, লোহার, পাটন, ডোম, হাড়ি ইত্যাদি জাত থেকেই তখন বাঁধা 'জুঝার' বা স্থায়ী যোদ্ধা নেওয়া হত। তাছাড়া ভাড়াটে সৈনিক নেওয়া হত প্রধানত মুসলমান, চৌহান রাজপুত, ওড়িয়া, তেলাঙ্গি ও পরে ফিরিঙ্গি জনসাধারণ থেকে।

রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে তখনকার ফৌজের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজার ডাকে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল, সেজে এল নানা রকমের সেনা :

হাসন হুসেন সাজে পায়ে দিয়ে মোজা,
যাহার সঙ্গতি সাজে বাইশ হাজার খোজা।
কাল ধল রাঙ্গা টুপি সবাকার মাথে,
রাঁমের ধনুক শর সবাকার হাতে।

থানাদার খানসামা-কাজির সাত হাজার সওয়ার

বিশাশয় কামানে সাজে বড় বড় গোলা,
দাম দুম শব্দ শুনি চঞ্চলা অচলা।

তা ছাড়া সর্দার-সিপাই সাজে বাহাদুর খাঁ এবং 'সাজিল হাতির পিঠে

বঙ্গ মিয়া কাজি।' সামন্ত রাজারাও এলেন—বর্ধমানের কালিদাস, ধলভূম ও মল্লভূমের রাজারা, এমন কি রাজপুরোহিত বিনোদ ঘোষালও।

সাজিল আগরি ভুঞা দক্ষিণ হার্জরা
আট হাজার ঢালি সঙ্গে যেন খসে তারা।

এল বাগদি গজপতি যে 'আপ্তবলে হানা দেই নাহি মানে বিধি।' হাড়ি-ডোমের 'পায়ে বাজে নূপুর, ঘাগর বাজে ঢালে।' মাজিয়া-র 'যমের সমান' রানা-ঢালিরা 'টেড়ি কর‍্যা পাগ বান্ধে' আর ইন্দু মিঞা খোন্দকারের পেছনে 'রানা পাইক দেখা দিলে রক্ষা আছে কার।' আর সব শেষে জয়ঢোল বাজিয়ে এল ভুঞা কোলের দল ঃ

চিকুরে চিরণি আছে অঙ্গে রাঙ্গা মাটি,
জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দিবারাতি।

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মল্লভূমির রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

উটের উপরে বাজে টমক নিশান ··
গজপৃষ্ঠে থাং থাং বাজে জোড়া দাম···
হরিপালের সাজি আইল কালিদাস বুড়া.
বাঁটুলে ভাঙিতে পারে দেউলের চূড়া।...
লম্পট ফাঁসুড়ে কত গাঁটকাটা চোর
বার কাহন সাজিল ভূতালে গাঁজাখোর।

চার

ভারতের তথা বাংলার ইতিহাসে মুসলমানের আবির্ভাব একটা আকস্মিক ও অকারণ ব্যাপার নয়। কতকগুলো আভ্যন্তরীণ কারণেই প্রধানত এটি সম্ভব হয়। প্রাচীন যুগের জীবনধারা মোটামুটি একই খাতে বয়ে চলে নির্জীব হয়ে আসছিল এবং তারই লক্ষণ দেখা

দিয়েছিল সমাজের সর্বাঙ্গীন ভাঙনে। তা না হলে মুসলমানের আবির্ভাব কয়েকটা খণ্ড অভিযানেই শেষ হয়ে যেত, ভারতের মাটিতে মুসলমান সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। মুসলমানের আগেও আর্য, শক, গ্রীক, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি বহু জাতি এসে ভারতের আদিম অধিবাসীদের বিপর্যস্ত করেছে। আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের বিরোধ হিন্দু-মুসলমান বা ইংরেজ-ভারতীয় বিরোধের চেয়ে কোনো অংশে কম তীব্র ও মর্মান্তিক ছিল না। এদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য ছিল—আর্য, শক, হুণ, কুষাণ ইত্যাদির। কিন্তু সমন্বয়ের মধ্যে বিরোধী স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে যে এই সমন্বয় একদিনে হয়নি, বহু শতাব্দী লেগেছে। হিন্দু বৈশিষ্ট্য ও মুসলিম বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ সমন্বয় মধ্যযুগের পাঁচ শো বছরে ঘটে ওঠেনি। তারপর আধুনিক যুগের দু শো বছরে তৃতীয় পক্ষের চক্রান্তের জন্য সেই সমন্বয়ের সম্ভাবনা নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে মুসলমান মধ্য প্রাচ্যের কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিনিধি হয়ে এদেশে আসেনি, স্বদেশের সঙ্গে বিশেষ কোনো যোগসূত্রও রাখেনি। ভারতের ও বাংলার মাটিতে সে দেশী আবহাওয়ার মধ্যেই জীবন কাটিয়েছে। বিবাহ ও ধর্মান্তরগ্রহণের সূত্রে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের রক্তের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পার্থক্য আছে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথায়, কিন্তু সারা মধ্য যুগে এসব ব্যাপারেও প্রচুর সমন্বয় হয়েছিল। তা ছাড়া জল, মাটি, সাহচর্য, অর্থনীতিগত সম্পর্ক, দেশজ (সাম্প্রদায়িক নয়) প্রথা ইত্যাদির ফলে মনে ও জীবনযাত্রায় পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশী। বিদেশীরা তাই 'হিন্দু' বলতে 'ভারতীয়' বোঝে ; মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশেও 'মুসলিম হিন্দু' মানে 'ভারতীয় মুসলিম'।

মোগল যুগের শেষ দিক আলোচনা করলে দেখি যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির দ্রুতবর্ধমান দুর্বলতা বাংলাকেও দুর্বল করে ফেলেছে। মারাঠাদের উত্থান, বিদেশী বণিকদের চক্রান্ত, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আর্থিক

শোষণ ও সমাজের ভাঙন সিরাজের যুগকে অন্তঃসারহীন করে তুলেছিল। মোগলদের বিরাট কীর্তির পিছনে রয়েছে অনেক দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকার, দুর্নীতি ও শোষণের দীর্ঘ ইতিহাস। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত তখনকার দিনে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ইংরেজকে সহায়তা করার ব্যাপারে তাই বিস্মিত হবার কিছু নেই। গোলামির জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে এই চক্রান্ত হয়নি ; তাহলে পরে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ হত না ; অভাব ছিল স্বার্থান্ধ নেতাদের দূরদর্শিতার। পোর্তুগীজদের সঙ্গে বারভুঁইয়াদের স্বার্থের খাতিরে যেমন চুক্তি হত, ঠিক তেমনি ব্যাপারই হয়েছিল সিরাজের বিরুদ্ধে। সিরাজের ওপরে আক্রোশ ছিল একাধিক নেতার একাধিক কারণে—জগৎ শেঠ, মীর জাফর। ঘসেটি বেগমের দায়িত্বও কম নয়। পলাশীর যুদ্ধে বাঙালীর বীরত্ব ও বুদ্ধির অভাব ছিল না, ছিল ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির। এই চক্রান্তের ফলে ইংরেজের শক্তিবৃদ্ধি ও জাতির বিপদ ঘটতে পারে এ কথা নাকি শুধু এক রানী ভবানীই ভেবেছিলেন। সন্তানবয়সী সিরাজকে তিনি একাই বোধ হয় ক্ষমা করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের নাটকীয় পরিণতি হল ইংরেজদের দেওয়ানি লাভে। কিন্তু তখনো যে চেতনা হয়নি এবং কোনো যৌথ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়নি তা থেকেই বোঝা যায় যে বাঙালীর জীবন কতো নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।

পাঁচ

পাঠানদের আগমনে বাংলার নাগরিক ও গ্রাম্য অর্থনীতি খানিকটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তার কারণ এই যুগের যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন ও অরাজকতা। কিন্তু অনেকটা অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বাঙালী তার গ্রাম্য সমাজের অর্থনীতির কাঠামো মোটামুটি বজায় রেখে অনেক বিষয়ে উন্নতিও করেছিল। এর কারণ এই যে পাঠানেরা

বেশীর ভাগ সময়েই যুদ্ধে ব্যস্ত থেকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেনি। অর্থব্যবস্থার দায়িত্ব মোটামুটি হিন্দুদের হাতেই ছিল এবং এর ধারা পুরানো খাতেই চলত। গণতান্ত্রিক ইসলাম কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে কোনো রকম উন্নতি করেনি। আমীরওমরাহ বা উচ্চবর্ণের লোকেরা সুখে ও বিলাসিতায় জীবন যাপন করতেন। কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দু বা ধর্মান্তরিত মুসলিম জনসাধারণ বিশেষ কষ্টে না থাকলেও দরিদ্রই ছিল। বৈদেশিক লেখকেরা দেশের সর্বত্র আর্থিক ব্যাপারে এই শ্রেণীবৈষম্য দেখেছেন।

মোগল যুগে কেন্দ্রীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রবল হওয়ার ফলে রাজস্বের বেশির ভাগই চলে যেত দিল্লিতে ; এ ব্যাপার কিন্তু পাঠান আমলে ঘটেনি। মুর্শিদকুলি খাঁ তো কোষাগারে ধনরত্নের স্তূপ গড়ে তুলেছিলেন। ইংরেজরা বাংলা দখল করে লুঠতরাজ ও ঘুষের দ্বারা যে কল্পনাতীত শোষণ করেছিল তা সম্ভব হল কী করে? এত সম্পদ এল কোথা থেকে? জনসাধারণ বঞ্চিত হয়েই এই অর্থস্তূপ রাজকোষে ও ধনীদের গৃহে তুলে দিয়েছিল।

দেশে অবশ্য কঠোর দারিদ্র্য ছিল না। কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান যে খুব উচ্চ ছিল না তা বৈদেশিক লেখকদের কথা থেকেই বোঝা যায়। নগরে ও গ্রামে জনসাধারণের গৃহ ও গৃহসজ্জা দৈন্যই নির্দেশ করত। নগরগুলি নদীতীরে অবস্থিত থাকায় তাদের দৈর্ঘ্য ছিল বেশী ; কয়েকটি পথ ছাড়া বাকিগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। বাঁশ, কাঠ, মাটি দিয়েই ঘর তৈরী হত। ইট-পাথরের বাড়ী নগরেও বেশী ছিল না। ঘরের দরজা জানলা সাধারণত ছোটই ছিল। উঁচু প্রাচীর তুলে বাড়ী ঘেরা থাকত। এই সব কারণে মহামারীর সময়ে নগরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হত। মহামারীতে গৌড় একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার ধুলো দূর করবার জন্য ভিস্তি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। রাজপথের দু ধারে গাছ ও সরাইখানা থাকত ; এখানেই পথিকদের আস্তানা ছিল।

ধুতি, উড়ানি ও শাড়ীই সাধারণে ব্যবহার করত। বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি থাকলেও জনসাধারণের বসনস্বল্পতা বৈদেশিকেরা লক্ষ্য করেছিলেন। নানা রকম ছাতার ব্যবহার ছিল—তালপাতা, গুয়াপাতা ও বেতের কাঠি দেওয়া কাপড়ের। শেষোক্ত বড় বড় ছাতা সঙ্কীর্তন ও শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হত।

পাঠান অধিকারে সামান্য আদায়কারীরা বংশানুক্রমে কাজ করার পর অনেক-সময়ে প্রবল জমিদার হয়ে উঠত। পাঠান ও মোগল আমলে এই রকম শক্তিশালী জমিদারের সংখ্যা অনেক ছিল। জমিদারির উচ্ছেদ আইনসঙ্গত হলেও এই রকম উচ্ছেদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না, নিলামের ব্যবস্থাও নয়। এই সব কারণে জমিদারেরা ক্রমে স্বত্ববিশিষ্ট ভূস্বামী হয়ে ওঠে। হিন্দুরাজত্বে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব ছিল, কিন্তু মুসলমান আমলে প্রজাস্বত্ব ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হচ্ছিল মধ্যস্বত্ব-অধিকারী শ্রেণীর।

বৈদেশিক বিবরণ থেকে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার অনেক কথা জানতে পারা যায়। ইতালীয় ও পোর্তুগীজ পর্যটকরা 'বাংগেলা' শহরের সমৃদ্ধির কথায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। এই শহর ছিল বিরাট ব্যাবসাকেন্দ্র। বস্ত্র, আখ, চিনি, আদা ইত্যাদি বহু দ্রব্যের ব্যাবসা হত; সাতগাঁ বন্দরে বছরে ৩০।৩৫ খানি জাহাজে চাল, কাপড়, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের চালানের বন্দোবস্ত ছিল। রল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ বাংলার অনেক শহরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে চাল ও কাপড় উৎপন্ন হত। ইনি শ্রীপুর ও সোনার গাঁ শহরের সমৃদ্ধির কথাও বলেছেন। এঁর মতে সোনার গাঁ অঞ্চলেই ভারতের উৎকৃষ্টতম বস্ত্রশিল্প ছিল।

কিন্তু এত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও জনসাধারণের হাতে টাকা শুধু অল্প ছিল না, তার ব্যবহারে সামর্থ্য ও সুযোগও অল্প ছিল। শ্রমজীবীদের অবস্থা ভালো না হলেও কৃষক ও কারুশিল্পী মোটামুটি অভাবগ্রস্ত ছিল না। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় তাই বাংলার নাম ছিল 'জিন্নৎ

উল্ বেলাৎ' (মর্তোর স্বর্গ)। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন এখানে ছিল। সৈন্যদলে ও অর্থবান লোকদের অধীনে বহু দাস থাকত। ফিরিঙ্গিরা ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা অনেক সময়ে মধ্য প্রাচ্যে এ দেশের লোককে বিক্রয় করে আসত। বিহারে 'নফর' বেশী মিলত কিন্তু বাংলাতেও অভাব ছিল না। ক্রীতদাসদের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পপ্রভাব বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা শোনা যায় না ; বাংলাই দিল্লি সাম্রাজ্যের খাদ্য ও বস্ত্রের উৎস ছিল। অজন্মা হলে অবশ্য শস্য পাঠানো কিছু বন্ধ করে সময়োচিত ব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা হত।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাঙালীর আথিক জীবনে আবির্ভাব হল বিদেশী বণিকদের। ফিরিঙ্গি বা পোর্তুগীজ বণিকেরা এই সময়ে প্রাচ্যের মশলাবাণিজ্য দখল করে বসেছিল। সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে তাদের পত্তন শুরু হবার পরেই বঙ্গোপসাগর ও বাংলার নদীপথে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়ল। ক্রমে হুগলি, হিজলি, তমলুক, ঢাকা, শ্রীপুর, বাক্‌লা প্রভৃতি জায়গায় ফিরিঙ্গিদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচ্য বাণিজ্যের ওপর এদের এমন অধিকার হয় যে এদের ছাড়পত্র ছাড়া ভারতীয়েরাও জলপথে বাণিজ্য করতে পারতেন না। বারভুঁইয়াদের পরস্পর দ্বেষ ও মোগলবিরোধী পাঠান-নীতি এদের সাহায্য করেছিল। কিন্তু এদের বাণিজ্যাধিকার বেশি দিন টেকেনি শুধু অত্যাচারের জন্য। এদের কাছ থেকে কিছু কিছু সুবিধা অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এ কথা ঠিক যে এদের জন্য বাঙালীর আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর এবং এদেরই উৎপাতে বাঙালীর বহির্বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়।

পোর্তুগীজদের পরে মধ্য যুগের বাংলার অর্থনীতির ইতিহাসে ইংরেজ-ওলন্দাজ-ফরাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি বেশী দিন স্থায়ী না হলেও ইংরেজ-ফরাসীর সংঘর্ষ বাণিজ্য থেকে আরম্ভ করে সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

পরিণত হয়। হুগলি ও কলকাতায় বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের পর ব্যাবসার ব্যাপারে ইংরেজদের প্রভুত্ব আরম্ভ হল; চন্দননগরের ফরাসী ঘাঁটি বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারল না। মোগল যুগের শেষ দিকে যে দুর্নীতির স্রোত বয়েছিল তারই সুযোগে ইংরেজরা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে ও নানা প্রকার অসৎ উপায়ে বাণিজ্যশুল্কের এমন সুবিধা করে নিয়েছিল যে দেশী-বিদেশী কোনো বণিক আর তাদের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। এই ভাবে শোষণের ইতিহাস এগিয়ে চলে এবং বাংলার ব্যাবসা-বাণিজ্য ইংরেজদের হাতে চলে যায়। বাংলা থেকে ইংরেজ প্রতিনিধি ১৮৯৮ সালে লিখে পাঠিয়েছিলেন; 'ফার্মান্, দানপত্র ও সন্ধিসূত্রে কোম্পানী ভারতের প্রায় সর্বত্র অতিরিক্ত বাণিজ্য-সুযোগ পেয়েছেন এবং শুল্ক থেকে একেবারে রেহাই পেয়েছেন; অন্য ইউরোপীয় বণিক, এমন কি দেশীয় বণিকও, এত সুবিধা পায়নি।' সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই এইভাবে মোগল শাসনকর্তারা স্বার্থ ও মূর্খতার জন্য বাংলার তথা ভারতের অর্থনীতির ও রাজনীতির সর্বনাশের গোড়াপত্তন করেন।

বাংলায় ইংরেজদের আগমনের (১৬৫১) সময়ে বৃহৎ বঙ্গ ছিল ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সপ্তগ্রাম নষ্ট হলেও হুগলি ও কাশিমবাজার তখন বিখ্যাত বন্দর। চাল, গম, চিনি, তেল, ঘি, মসলিন, রেশম প্রভৃতি দ্রব্য স্থলপথে ও বিশেষত জলপথে তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের নানা দেশে রপ্তানি হত। প্রায় এক শো জাহাজ প্রত্যেক বছর বাংলার বিভিন্ন বন্দর থেকে বহির্বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। হিন্দু বণিকদের ওপর প্রভেদাত্মক কর প্রচলিত ছিল; তাই অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় ইংরেজরা সহজেই দেশীয় হিন্দু বণিকদের উচ্ছেদ করতে সুবিধা পেল। এ ছাড়া বাণিজ্য জাহাজের ওপরে লুটতরাজ তো ছিলই। বাণিজ্যের অধোগতির সঙ্গে বহু শিল্পের লোপ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লব শুরু হয়

এক

ইংরেজ এসেছিল বণিকের মূর্তিতে, যোদ্ধার নয়। ভারতের মাটিতে সে বাসিন্দা হয়নি; কর্মজীবনের শেষে সে ফিরে গেছে তার দ্বীপের দেশে। শোষণরিক্ত ভারতের মানুষকে অপমান করে স্বদেশকে করেছে সে স্ফীত ও সাম্রাজ্যগর্বে দৃপ্ত। রাষ্ট্রনীতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে এ দেশের রক্তে অনেক ইংরেজই মিশে যেত, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বিদেশী প্রবাসী হিসাবে সে থেকেছে এ দেশে, অথচ আমাদের ফসলে সে ভরেছে তার নিজের গোলা। তাই এ মাটি করেছে বিদ্রোহ। ইংরেজের 'ভারত-ত্যাগ' এখনো সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই এখানে। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই এসেছিল ১৯৪৭র ১৫ই অগস্ট।

তবে ইংরেজ নিয়েছে যেমন অনেক কিছু, দিয়েছেও তেমনি অনেক কিছু। সে অনিচ্ছায় সৃষ্টি করেছে সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তা, দিয়েছে সে আধুনিক মন। আমাদের ভুলের দাম ইতিহাস কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছে আজ দু শো বছর ধরে। কতো যে জড়তা আমাদের ছিল তা বুঝি তখন, যখন ভাবি কী নিদারুণ আঘাতের ফলে আমাদের চেতনা এসেছে এতোদিনে, তাও অসম্পূর্ণ অবস্থায়। জাতির মর্মস্থানে দিনের পর দিন আঘাতে ধ্বংস হয়েছে অনেক কিছু, কিন্তু তার ফলে ইতিহাসেরও মোড় ফিরেছে নব বিপ্লবী ধারার পথে।

রাষ্ট্রনীতির ধারা বিশ্লেষণ করে আধুনিক যুগকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা চলে: (১) ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৭; (২) ১৮৫৭ থেকে ১৯১২; (৩) ১৯১২ থেকে ১৯৭৭।

১৭৬৫-১৮৫৭: ১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ

আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি নিলেন ক্লাইভ্। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এসেছিল এদেশে বাণিজ্যের জন্য, এখন পেল শাসনভার। এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা যে কোন দেশের ইতিহাসেই বিরল। অবশ্য প্রথম দিকে শাসনের চেয়ে লুণ্ঠন ও শোষণের ওপরই নজর ছিল বেশী। ভারতে বা বাংলায় সেটা ছিল মাৎস্যন্যায়ের যুগে আর সেই সুযোগে চক্রান্ত ও সামরিক শক্তির দ্বারা ইংরেজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল রাজ্যবিস্তারের পথে। শাসনভারের দায়িত্ব গ্রহণ করা কোম্পানীর অভিপ্রায় ছিল না। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হবার পর এবং বিশেষত ১৭৮৪ সালে শাসনব্যবস্থায় ইংরেজ হস্তক্ষেপ করল। হেষ্টিংস্ হলেন প্রথম গভর্ণর-জেনারেল। কলকাতাকে রাজধানী করে ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তার করে চলল। ১৮২৬ সালে আসাম দখল উল্লেখযোগ্য, কারণ এর ফলে সম্পূর্ণ পূর্বভারত ইংরেজের হাতে এল এবং সারা পূর্বভারতের জীবনকেন্দ্র হল কলকাতা। কোম্পানীর যুগ শেষ হল ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে। বাংলা দেশের বারাক্‌পুরেই বিদ্রোহ শুরু হয় আর পরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালীর স্থান সামান্য; বরং বাংলার মধ্যবিত্তেরা ও প্রতি-পত্তিশালী লোকেরা এই বিদ্রোহে বিশেষ কোনো সহানুভূতি দেখাননি। এই বিদ্রোহের মূলে খানিকটা জাতীয় চেতনার আভাস থাকলেও আসলে এটি ছিল ভারতীয় সামন্তবর্গ ও ধনপতিদের প্রভুত্ব ফিরে পাবার প্রয়াস। কিন্তু এই ব্যাপারেও ঘটল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বার্থবিরোধ; ফলে বিদ্রোহ হল বশ্যতা।

১৮৫৭-১৯১২ : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বে অনেক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হলেও কোম্পানীর দুর্নীতি বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া এই বিশাল দেশকে ভালো ভাবে শাসন করা একটি ব্যবসায়ী দলের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে নানা কারণে দেশব্যাপী অসন্তোষ প্রকাশ পেল সিপাহী বিদ্রোহে। তা ছাড়া

বিলাতী ধনপতিদের দল চাইল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারতকে ছিনিয়ে নিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে শোষণ করতে। তাই ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় কোম্পানী-শাসন শেষ হয়ে আরম্ভ হল পার্লামেন্টের অধীনে খাঁটি ব্রিটিশ শাসন ১৮৫৮ থেকে। ১৮৭৪ থেকে আসাম আলাদা হয়ে গেল বাঙালী-অধ্যুষিত শ্রীহট্ট ও কাছাড় নিয়ে। ১৮৮৫র ঐতিহাসিক ঘটনা কংগ্রেসের জন্ম। জাতীয় চেতনাবৃদ্ধির সঙ্গে আসে ১৯০৫র বঙ্গবিভাগ —পূর্ব ও পশ্চিম, পদ্মার এপার ও ওপার। বাহ্যত শাসনের সুবিধার জন্য বিভাগ হলেও, আসল উদ্দেশ্য ছিল নবজাগ্রত বাংলার রাজনীতিক চেতনাকে নির্জীব করে দেওয়া। কিন্তু ফল হল বিপরীত, রাজনীতিক আন্দোলন হল সন্ত্রাসবাদ। ১৯০৯র মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কার পরিবর্তন আনলেও পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর করতে পারেনি।

১৯১২-১৯৪৭ ঃ ১৯১২ থেকে পঞ্চম জর্জের ঘোষণানুযায়ী বঙ্গ-বিভাগ রদ হল বটে, কিন্তু বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর নিয়ে আর একটি প্রদেশের সৃষ্টি হল আর তার সঙ্গে গেল মানভূম-ধলভূমের বাঙালী অঞ্চল। আর একটি পরিবর্তন হল ঃ কলকাতা থেকে রাজ-ধানী গেল দিল্লিতে। বাইরের ব্যাখ্যা যাই হোক, এই পরিবর্তন-গুলির প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে শাস্তি দিয়ে ভারতের নব জাগৃতির প্রতি পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। ১৯১৪-১৮র প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে রাষ্ট্রীয় অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাকে শান্ত করবার জন্যই প্রবর্তিত হল দ্বৈতশাসনরীতি। ১৯৩১র 'সাম্প্রদায়িক দান' ও 'গোল টেবিল' রাজনীতি ইংরেজ শাসনের আর এক পর্যায়। ১৯৩৯র যুদ্ধ আর বিক্ষোভ জন্ম দিল ক্রীপস্ প্রস্তাবের আর তারই ব্যর্থতা আনল ১৯৪২র ভয়ঙ্কর অগস্ট বিপ্লব। যুদ্ধের শেষে ভারত-ত্যাগের সিদ্ধান্ত হলেও মতদ্বৈধ চলল রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা নিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ আর মুসলিম

লীগের পাকিস্তান-দাবির জন্যই মন্ত্রি-মিশনের আয়োজন ব্যর্থ হল। ১৯৪৬র ১৬ই অগস্ট বাংলার ও ভারতের ইতিহাসে হিন্দু মুসলমানের 'প্রত্যক্ষ' সংগ্রামের রক্তাক্ত দিন, জাতীয়তার চরম ও শোচনীয় পরাজয়। আর তারই অনিবার্য ফল হল খণ্ডিত ভারতের ও খণ্ডিত বাংলার অসম্পূর্ণ স্বাধীনতা—১৫ই অগষ্ট, ১৯৪৭। ইংরেজী শাসনের শেষ পর্ব শুরু হয়েছিল বঙ্গবিভাগ রদ করে; ইংরেজী শাসন শেষ হল বঙ্গবিভাগকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে।

দুই

ইংরেজী শাসনের প্রথম পর্বে সারা ভারতের জাগৃতির ভিত্তি গড়ে উঠল বাংলায়; দ্বিতীয় পর্বে বাংলায় সেই জাগৃতির পূর্ণ বিকাশ সারা ভারতকে করল সচেতন; তৃতীয় পর্বের প্রথম দিকে ১৯২৫ পর্যন্ত ভারত ও বাংলার চিন্তা-ও-কর্মক্ষেত্রে আদানপ্রদানের যুগ; তার জের চলল ১৯৩১ পর্যন্ত; কিন্তু ১৯৩১র পরে ভারতের জীবন থেকে বাংলার জীবন খানিকটা আলাদা হয়ে গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর বিভিন্ন বামপন্থী বিপ্লবী মত।

লেলিন বলেছেন: 'ভারতে যে অত্যাচার ও লুণ্ঠনের নাম ইংরেজী শাসন তার সীমা নেই।' একজন ইংরেজ (কর্ণওয়াল্ লিউইস্) স্বীকার করেছেন: 'পৃথিবীর ইতিহাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতো এমন দুর্বৃত্ত ও বিশ্বাসঘাতক শাসকসম্প্রদায় কখনো দেখা যায়নি।' বাংলাই শোষিত হয়েছে সব চেয়ে বেশী। ১৭৭০ থেকেই বাংলার বিক্ষোভ শুরু হয়। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ ও শেষে নন্দকুমারের ফাঁসি স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূত্রপাত করে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে (যার ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ') দস্যুতস্করের উপদ্রব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৮৫৯-৬০র নীলকর আন্দোলন (যার ছবি দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ') অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণবিদ্রোহের সূচনা করে।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন ইংরেজ হিউম। উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধারা চালিয়ে রাষ্ট্রিয় অসন্তোষ দূর করা। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমেই জাতীয়তার চেতনা শুরু হল বাংলায়—আধুনিক ভারতে বাংলার শ্রেষ্ঠ অবদান। 'আন্দোলন'-রীতির জন্ম ১৯০৫ সালে আর তার প্রথম ফল ইংরেজ-বিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদ। এই সন্ত্রাসবাদ যে পন্থাই নির্দেশ করুক না কেন জাতির মেরুদণ্ডকে যে খানিকটা দৃঢ় করতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

> কল্যাণ আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য স্বাধীনতা। প্রতাপ চিতোর যখন জনহীন অরণ্যে পরিণত করেছিলেন তখন সমস্ত মাড়োয়াড়ে তাঁর চেয়ে অকল্যাণের মুর্তি আর কোথাও ছিলনা। সে আজ কত শতাব্দের কথা—তবু সেই অকল্যাণই আজও সহস্র কল্যাণের চেয়ে বড়ো হয়ে আছে। পরাধীন দেশের মুক্তিযাত্রায় পথের আবার বাচবিচার কি ?
>
> —শরৎচন্দ্র : পথের দাবি

এই হল সন্ত্রাসবাদের মূল নীতি আর এরই জায়গায় গান্ধিজী আনেন অহিংস অসহযোগের, সত্যাগ্রহের পন্থা। আবির্ভাব হল 'স্বরাজ' দলের। স্বরাজে জন্মসত্ব ঘোষণা করলেন চিত্তরঞ্জন। তারপরেই ইংরেজী চক্রান্তে আরম্ভ হল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। ১৯৩০র কংগ্রেসী আদর্শ হল পূর্ণ স্বাধীনতা; তারই উত্তর এল ১৯৩১র সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায়। বাংলার ইতিহাসে রাষ্ট্রিয় বিপর্যয় ঘটল : সাম্প্রদায়িক শাসন, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম,' বংগবিভাগ। ১৯৪২ সালে বাঙালী বিদ্রোহ করেছিল; মেদিনীপুরের গণ-বিদ্রোহ ভোলবার নয়। ১৯৪১র শেষ দিকে ভারতের বাইরে ইংরেজের

বিরুদ্ধে আরম্ভ হল মুক্তি-সংগ্রাম বাঙালী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে। আপাতদৃষ্টিতে ভারতের বাইরে এই মুক্তি-সংগ্রাম হয়তো ব্যর্থ বলে মনে হবে, কিন্তু যে কার্য-কারণের ধারাচক্রে স্বাধীনতা এসেছে তার মধ্যে একটি প্রধান স্থান রয়েছে এই সংগ্রামের।

> তোমাদের রণধ্বনি হোক : দিল্লি চলো, চলো দিল্লি।...শেষে জয়ী আমরা হবোই।...তোমাদের এই আশ্বাস দিলাম যে আলোয় বা অন্ধকারে, দুঃখে ও হর্ষে, শোকে ও জয়গর্বে আমি তোমাদেরই সাথী হবো। আজ তোমাদের কাছে দেবার মতো আমার কিছুই নেই ; আছে শুধু ক্ষুধা আর তৃষ্ণা, দুর্গম পথ আর অজস্র মৃত্যু। তোমরা একটি পতাকা ঘিরে দাঁড়াও, ভারতের মুক্তির জন্য আঘাত হানো।···দূরে, বহুদূরে নদ-নদী ছাড়িয়ে, অরণ্য-পর্বত ছাড়িয়ে ঐ আমাদের মাতৃভূমি।···দেখ, তোমাদের সামনে স্বাধীনতার পথ।···ভগবান যদি চান আমরা শহিদের মতো মৃত্যু বরণ করব। যে পথ ধরে আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লি পৌঁছবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করবার সময়ে আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করে নেব। দিল্লির পথই স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লি।

কিন্তু দিল্লিচলার এই মহা অভিযানের পথে বাধা দিয়েছিল '৪৬র 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'। তাই লক্ষ সমস্যার মধ্যে জন্ম নিল '৪৭র ১৫ই অগস্ট্। বাংলার দুর্ভিক্ষ, বাংলার দাঙ্গা, বাংলাবিভাগ—বাঙালীর জীবনে ইংরেজের শেষ কীর্তি।

তিন

১৭৬৫ সালে ইংরেজ বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপন করল। শোষণ এবার শুধু বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে নয় ; বণিকের ছদ্মবেশ ছেড়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ লুণ্ঠন ও উৎকোচ, কোম্পানীর আয়বৃদ্ধি এবং

ব্যক্তিগত লাভের জন্য অত্যাচার ইত্যাদি নানা উপায়ে বাংলাকে রিক্ত করে ফাঁপিয়ে তুলল নিজের মূলধন। "ইংল্যাণ্ডের আকস্মিক উন্নতি খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায় ১৭৬০ থেকে ১৮১৫র মধ্যে। মূলধন দিয়েছে বাংলা ও ভারত আর এর জোরেই ইংরেজ সারা পৃথিবীতে করেছে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তার।

ইংরেজী শাসনে পুরানো বণিক, মধ্যবিত্ত ও শিল্পীশ্রেণী নষ্ট হয়ে যায় ; তাদের জায়গায় আসে এক চাকুরে পেশাদার শ্রেণী। বস্ত্রশিল্পের স্বাধীন সওদাগর হল চুক্তিকারক দালাল, পরে গোমস্তা ও যাচনদার। দৈহিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারে তাঁতীরা তাঁত ছাড়ল আর আঠারো শতকের প্রথমেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের ওপর সারা য়ুরোপে শুল্ক চাপল ; নষ্ট হল রপ্তানি। ১৮৩৪ সালে এই ভাবে এক কোটি টাকার বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেল। বিলেতী কাপড়ের আবির্ভাবে দেশী তাঁতীদের বিপর্যয় আরম্ভ হল। এই ভাবে দিনে দিনে শিল্পনাশের ফলে জনসাধারণ অতিরিক্ত চাপ দিতে লাগল চাষের ওপর ; ফলে শিল্পমৃত্যুর যুগে কৃষিরও অপমৃত্যু ঘটবার লক্ষণ ঘনিয়ে আসতে লাগল।

খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস্ ভূমি-সংক্রান্ত কায়েমী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করলেন। ফলে চাষীর ঘাড়ে জমিদার ছাড়াও নানা স্তরের মধ্যবর্তী শোষকশ্রেণীর ভূত চাপল—পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, চুকনিদার ইত্যাদি। এ ছাড়াও জোতস্বত্ব ভোগ করার জন্য এক দল লোকের আবির্ভাব হল। ভূমিস্বত্বের ভাগাভাগি ও কৃষির পোষ্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে গ্রাম্য অর্থনীতির সংকট ঘনিয়ে এল। ভূমির শোষকের সংখ্যা বেড়েছে, কমেছে পোষকের। জোতস্বত্ব গ্রাস করেছে মহাজন আর ভূমিহীন কৃষাণ বৃদ্ধিতে ও চাষীর ঋণে কৃষি-অর্থনীতি তথা কৃষি-প্রধান দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

বাংলার প্রভু হয়ে ক্লাইভ্ বললেন : 'সমস্ত খরচ বাদ দিয়েও

কোম্পানির লাভ হবে ১৬,৫০,৯০০ পাউণ্ড।' কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরে' মন্বন্তরের পর হেস্টিংস লিখলেন হিসাব কষে : 'যদিও এ প্রদেশের তিন ভাগের একভাগ লোক মরেছে এবং চাষের চরম অবনতি হয়েছে তা হলেও ১৭৭০ সালের আদায় ১৭৬৮রও বেশী। এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে শুধু কড়া চাপে।' কী কড়া চাপ দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙালীর ওপর পড়েছিল তা কল্পনা করাও কঠিন। অথচ রাজস্বের শতকরা এক ভাগও দেশের জন্য খরচ করা হয়নি।

শোষণসঞ্চিত মূলধন থেকে গজিয়ে উঠল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক দরদী ইংরেজের সাহায্য বাঙালী পেয়েছে। কিন্তু যন্ত্র-ও-বিজ্ঞান যুগের যে অগ্রগতি, তা হয়েছে অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক কারণে। নিজেদের অজ্ঞাতসারে এবং পরে অনিচ্ছায় ইংরেজরা এ দেশকে আধুনিক প্রগতির পথে ঠেলে দিয়েছে। যন্ত্রদানবের আবির্ভাবে শ্রমশিল্প-যুগেরও আবির্ভাব হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন যে কী বিরাট তা বুঝতে পারি তখন যখন ভাবি যে এর ফলে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্য যুগের দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারা থেকে বাংলা ও ভারত একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কূপমণ্ডূকতা দূর হল রেলপথ, জাহাজ আর আকাশযানে। হাজার হাজার যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতে ও শ্রমশিল্পে, সোজা কথায়, একটা অভাবনীয় জীবনবিপ্লব এসে গেছে।

> বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতবর্ষে যে নতুন সমাজব্যবস্থার বীজ বপন করতে বাধ্য হবে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন ইংল্যাণ্ডের মজুরশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি দখল করবে, অথবা ভারতীয় জনসাধারণ সংগ্রাম করে বৃটিশের অধীনতা থেকে মুক্তি পাবে।
>
> —কার্ল্ মার্ক্স

হাণ্টার্ বলেছেন যে সারা ভারত বাংলা থেকে অর্থ শোষণ করেছে। মোগল যুগের অর্থনীতি ও পরে বৃটিশ শাসন এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু যন্ত্রযুগের আবির্ভাব ও মহানগরীর সৃষ্টি বাংলাতেই প্রথম হয়েছে আর তাই বাংলা দেশই ভারতের নবযুগ-চেতনার জন্মভূমি :

> আমরা হিন্দুদের মতো মন্দির বা মুসলমানদের মতো প্রাসাদ, মসৃজিদ্ ও কবর নির্মাণের দিকে তাকাইনি।...আমরা এসেছি আধুনিক নগর নির্মাণের জন্য। ভারতে নতুন শ্রমশিল্প-যুগের সূচনা হয়েছে।
>
> —হাণ্টার্

তাই হিন্দুদের গৌড় আর মুসলমান যুগের ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ থেকে আধুনিক কলকাতা অনেক দূরের পথ। 'চৈতন্য ভাগবত' লিখেছেন :

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই
যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই।
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে,
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।

কিন্তু হুতোম প্যাঁচার 'আজব শহর কলকেতা' বাংলার তথা ভারতের বিপ্লবী যুগান্তরের অগ্রদূত। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে ইংরেজী আমলে অর্থনৈতিক স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয়েছে। দারিদ্র্য, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ তো ইংরেজী শাসনের খাঁটি পরিচয় দেবে। অ্যামেরির মত মেনে নিয়ে পঞ্চাশের মর্মান্তিক মন্বন্তরকে কি 'দৈব ঘটনা' বলে শান্ত হওয়া চলে? ইংরেজের অর্থনৈতিক অবদান হল পুরানো ইমারতের ধ্বংসের ওপরে নতুন যুগের ভিত্তিস্থাপন।

প্রথম মহাযুদ্ধের অর্থনৈতিক আঘাত বাংলাকে বিপর্যস্ত করল। কিন্তু নতুন যুগের গতি ব্যাহত হয়নি। নতুন নতুন শ্রমশিল্প গড়ে

উঠতে লাগল। চাষীদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে এল, শুরু হল মধ্য-বিত্তের সংকট। বাংলায় অবাঙালীর অর্থনৈতিক আধিপত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই ব্যাপার অবশ্য নতুন নয়; মুসলমানী আমল ও বিশেষত মোগল যুগ থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়েছিল। ইংরেজের পূর্ব-ভারত নীতি ও পরে ভারতীয় অর্থনীতির স্বার্থের অখণ্ডতার জন্য অবাঙালী ব্যবসায়ী ও মজুর স্রোতের মত এসেছিল মহানগরে ও বাংলার শ্রমশিল্পকেন্দ্রের আশে পাশে। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঙালীর ব্যাবসাদারি খানিকটা এগিয়ে চলেছিল মধ্যবিত্তের অন্ন বস্ত্রের সংকটের তাগিদে। কেরানীগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি আর শিক্ষকতায় অন্নসংস্থান হওয়া কঠিন হল। ধীরে ধীরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল—বাঙালী ও অবাঙালীর, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে নবচেতনাও ক্রমশ প্রকাশ পেল চাষী-মজুরের আন্দোলনে। রাজনীতি ও সমাজের মূলে যে অর্থনীতির প্রভাব থাকে উনিশ শতকের সংস্কৃতির জোয়ারে এই কথাটি লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। অন্নবস্ত্রে টান পড়তেই অর্থনৈতিক চেতনার ফলে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে ও কর্মজীবনে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল।

বৃটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতি মানেই সুপরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী দীর্ঘ ইতিহাস। ইংরেজী আমলের আগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা নিচের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়:

> …ক্ষুদ্রতম গ্রামেও চাল, ময়দা, মাখন, দুধ, শাকসবজি, চিনি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়
>
> —ট্যাভার্নিয়ার্

> …মোগল রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলাই ফরাসী দেশে সব চেয়ে বেশী পরিচিত। সব জিনিসই এখানে প্রচুর—ফল, ডাল, রেশমী ও সুতী কাপড় ইত্যাদি।
>
> —মান্নুচি

…বাংলা মিশরের চেয়েও অনেক বেশী ধনী।…রাজমহল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত অসংখ্য খাল গঙ্গা হতে প্রাচীনকাল থেকেই কাটা হয়েছে জলসেচ ও জলপথের জন্য।

—বার্নিয়ার্

.. এই শহর (মুর্শিদাবাদ) লণ্ডনের মতোই বৃহৎ, জনবহুল ও ধনসম্পন্ন। প্রভেদ এই যে মুর্শিদাবাদের ধনী ব্যক্তিরা লণ্ডনের বড়লোকদের চেয়ে অনেক বেশী অর্থশালী।

—ক্লাইভ্

অবশ্য এ সব বর্ণনায় খানিকটা অতিরঞ্জন ও উচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু তা হলেও বোঝা যায় যে বাংলার অপরিমেয় সম্পদের লুণ্ঠনই রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে বিরাট শ্রমশিল্পযুগের আবির্ভাবের মূলে।

চার

ইংরেজী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থায় তিনটি পর্যায় দেখা যায় : (১) প্রত্যক্ষ ভাবে লুণ্ঠন ; (২) বিদেশী বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় শ্রমশিল্পের ধ্বংস ; (৩) বিদেশী মূলধনের দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে পরোক্ষ ভাবে শোষণ। প্রথমটির ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি এল উনিশ শতকে এবং তৃতীয়টি উনিশ শতকের শেষ থেকে চলেছে বর্তমান সময় পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়টি বাংলায় খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায় ; শেষের দুটি আরো জটিল, কারণ উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতি থেকে পৃথক ভাবে দেখা কঠিন। প্রথমটির বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য হচ্ছে এই যে, বাংলা-লুণ্ঠনই প্রধানত ইংরেজের বিরাট শ্রমশিল্পযুগের সৃষ্টি সম্ভব করেছে আর তার ফলে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

মোগল আমল থেকেই নানা রকম অসদুপায়ে ব্যাবসার ছদ্মবেশে

ইংরেজের লুণ্ঠন আরম্ভ হয়েছিল ; দেওয়ানি পাবার পরে তার বৃদ্ধি হল। ১৭৬২ সালে বাংলার নবাব অভিযোগ করলেন !

আসল দামের এক-চতুর্থাংশ দিয়ে এরা দেশীয় চাষী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে মাল আদায় করে এবং এক টাকা দামের জিনিস পাঁচ টাকায় চাপিয়ে দিয়ে যায়।

১৭৭৩ সালে পার্লামেণ্টে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিবরণীতে দেখা যায় যে দেওয়ানির প্রথম ছয় বছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১,৩০,৬৬,৭৬১ পাউণ্ড। তা ছাড়া কর্মচারীরা লুণ্ঠন ও উৎকোচের দ্বারা কল্পনাতীত সম্পদ সংগ্রহ করে। আড়াই লক্ষ পাউণ্ড নিয়ে ক্লাইভ্ ঘরে ফেরেন ; তা ছাড়া তাঁর জমিদারির বাৎসরিক আয় ছিল সাতাশ হাজার পাউণ্ড। ইংরেজের লোভ ও লুণ্ঠনে বাঙালীর কী দুর্দশা হয়েছিল তা বর্ণনা করা যায় না। ১৭৬৪ সালে নবাবী আমলে খাজনা ছিল ৮,১৭,০০০ পাউণ্ড; ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিসের কায়েমি বন্দোবস্তে খাজনা হল ৩৪,০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ চার গুণেরও বেশী।

এই সুন্দর দেশ…ইংরেজী শাসনে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। …এই ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ দেশব্যাপী শিল্পের ওপর কোম্পানির একাধিপত্য।

—মুর্শিদাবাদের ইংরেজ কর্মচারী বেচার্ (১৭৬৯)

আমাদের কুশাসনের এমনি দুর্বার উৎসাহ যে কুড়ি বছরের মধ্যেই দেশের অনেক স্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

—পার্লামেণ্টের সদস্য ফুলার্টন্ (১৭৮৭)

আজ যদি আমাদের ভারত ছাড়তে হয় তা হলে ওরাংউটাং বা বাঘের চেয়ে কোনো ভালো জানোয়ারের অধিকারে যে এ দেশ ছিল তা প্রমাণ করবার কিছুই থাকবে না।

—বার্ক

অথচ ১৮৫৮ সালেও সদাশয় মহামতি জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ কোম্পানির 'পবিত্রতম উদ্দেশ্য' ও মানবত্বের মহত্তম কার্যের গুণকীর্তন করেছেন। এই ওকালতির উদ্দেশ্য ছিল এই যে কোম্পানির হাত থেকে শাসনভার যেন সিপাহী বিদ্রোহের পরেও চলে না যায়।

ব্রুক্ অ্যাডাম্স্ লিখেছেন !

> পলাশীর যুদ্ধের পরেই বাংলা-লুণ্ঠনের অর্থ লণ্ডনে আসতে শুরু করল এবং অবিলম্বেই ফল বোঝা গেল।...১৭৬০র আগে ল্যাংকাশায়ারে বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি ভারতের মতোই সহজ সরল ছিল; আর ১৭১০ সালে ইংল্যাণ্ডে লৌহশিল্পের অবস্থা তো অতি শোচনীয়...১৭৫৭য় পলাশীর যুদ্ধ হল আর তার পরে দ্রুত পরিবর্তনের বোধ হয় কোনো তুলনাই মেলে না।

তার পরেই 'ব্যাংক্ অফ্ ইংল্যাণ্ড্' ১৭৫৯ থেকেই মূলধনে ফেঁপে উঠল। ১৭৬০ থেকে ১৭৬৮র মধ্যে উৎসাহ ও তাগিদের ফলে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হল যার ফলে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এক অভাবনীয় শ্রমশিল্পযুগের আবির্ভাব ঘটল।

১৮১৩ থেকে আরম্ভ হল দ্বিতীয় পর্যায়। ১৮১৪ আর ১৮৩৫র মধ্যে ইংল্যাণ্ড্ থেকে ভারতে কাপড়ের রপ্তানি বাড়ল ১০ লক্ষ গজ থেকে ৫১ কোটি গজেরও ওপর। ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানি কমে গেল তিরিশ বছরে (১৮১৪-১৮৪৪) সাড়ে বারো লক্ষ থেকে তেষট্টি হাজারে। বিদেশী শ্রমশিল্পের যান্ত্রিক আঘাতে বাংলার তাঁতীর মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। এই ভাবে একটির পর একটি শ্রমশিল্প নষ্ট হয়ে যেতে লাগল আর অতিরিক্ত চাপ পড়ল চাষের ওপর। কারুকারেরা শ্রমশিল্প থেকে বিতাড়িত হয়ে হল চাষী, মজুর, ভিক্ষুক। দারিদ্র্য ও অন্নাভাবে দেশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল। শুধু উনিশ শতকের শেষার্ধেই সারা ভারতে ইংরেজের সুশাসনে ২৪টি দুর্ভিক্ষে

২ কোটির ওপর লোক মারা গেল। অতিরিক্ত জনসংখ্যাবৃদ্ধি হয়নি; বৃদ্ধির হার ইংল্যাণ্ডের চেয়ে অনেক কম ছিল। দুর্গতির কারণ পুরানো দেশী শ্রমশিল্পের ধ্বংস আর বিদেশী বণিক সরকারের নির্মম শোষণ।

> ঢাকা, ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার, উন্নত অবস্থা থেকে নেমে গেছে দারিদ্র্যে; সেখানে অপরিসীম দুঃখকষ্ট।
>
> —চার্ল্‌স্ ট্রেভ্‌ল্যান, ১৮৪০

> এই অধোগতি শুধু ঢাকায় নয়, অন্যান্য জেলাতেও।
>
> —হেন্‌রি কট্‌ন্‌, ১৮৯০

> আমি স্বীকার করি না যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষি ও শ্রমশিল্প সমভাবেই তার ছিল।…
>
> —মণ্ট্‌গোমারি মার্টিন্‌

কাঁচা মাল সরবরাহ করা আর ইংরেজের তৈরী মাল কেনার জন্য বৃটিশ ধনতন্ত্রের চাপেই ভারত ও বাংলা হয়ে পড়েছে কৃষিপ্রধান।

১৯১৪-১৮র মহাসমরের পর তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হল। পুরানো পদ্ধতিতে নানা রকম শোষণ মোটামুটি বজায় রেখে নতুন পদ্ধতিরও সৃষ্টি হল—অর্থাৎ লুণ্ঠিত অর্থের খানিকটা অংশ শ্রমশিল্পের মূলধনে লাগিয়ে এ দেশের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প ইংরেজ নিজের মুঠোয় এনে ফেলল। কিন্তু সব সময়েই তার নজর ছিল যেন শ্রমশিল্পের প্রসার কম হয়। এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও নিজের শত বিপদ সত্ত্বেও ইংরেজ এই নীতি ছাড়েনি। অ্যামেরিকান্ টেক্‌নিক্যাল্ মিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ইংরেজ এ দেশকে পিছিয়ে রেখেছিল; অথচ ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে শ্রমশিল্পপ্রসারের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। মহাযুদ্ধের গুরু অর্থনৈতিক ভার ভারতের ওপর চাপল; ভারতের ঋণও ইংরেজ শোধ করল না। স্বাধীনতার

সময়েও ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে ইংগ-মার্কিন মূলধনের প্রভুত্ব অটুট রইল।

সমগ্র 'বৃটিশ' ভারতে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৭৫ কোটি পাউণ্ড (১৯৩৮-৩৯); তার মধ্যে ৫৭ কোটি শুধু বাংলা দেশেই, অর্থাৎ শতকরা ৭৬ ভাগ। আবার বাংলার জয়েন্ট্ স্টক্ কোম্পানির সমগ্র মূলধন প্রায় ৮৯০ কোটি টাকা আর এর মধ্যে বিদেশী মূলধন ৭৭০ কোটিরও বেশী, অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৮৬ ভাগ। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে বাংলার অর্থনীতি কী ভাবে বিদেশীর হাতে ছিল। শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ মূলধন নিয়ে বাঙালী ও অবাঙালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ। অথচ সেই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। বঙ্গবিভাগের মূলে এই মূলধনের স্বার্থ একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ১৯৪৬র জুলাই মাসেও পার্লামেন্টে ডাল্টন্ বলেছিলেন যে বৃটিশ মূলধনের বিশেষ কিছুই ভারতীয়দের হাতে যায়নি; বরং নানা ভাবে বিদেশী মূলধন ভারতে প্রবেশ করছে।

১৯৩৯র মহাযুদ্ধ হল এক মর্মান্তিক শিক্ষার বাহন। মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, দুর্ভিক্ষ, চোরা কারবার, কৃষক জাগরণ, শ্রমিক আন্দোলন ও খণ্ডিত স্বাধীনতার জটিল অর্থনীতি—বিপর্যয়ের এই ধারাবাহিক ইতিহাসে প্রমাণিত হল বাঙালীর নিঃস্বতা। আজ বিত্তহীন মধ্যবিত্ত অসন্তোষের স্রোতে ভেসে চলেছে চাষী-মজুরের আশেপাশে। পুরানো বন্দর ভেঙে গেছে। এখন ভাসো নতুন দ্বীপের আশায়।

৪ সমস্যা

এক

বিশ শতক থেকেই ইংরেজ বাংলাকে 'সমস্যা-প্রদেশ' বলতে শুরু করেছিল।, তার কারণ ইংরেজ যে শাসনপ্রণালী ভারতে চালিয়েছিল তার ফলে বাঙালীর জীবনই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে জটিল। নতুন ভাবধারা বাঙালীই গ্রহণ করেছিল সর্বপ্রথমে আর প্রতিক্রিয়াও তাই দেখা দিয়েছিল সবার আগে। নিপীড়নও তাই এখানেই হয়েছে বেশী। সারা ভারতে ইংরেজী আমলের প্রথম দিকে বাঙালী প্রভুত্ব করেছিল; তারও প্রতিক্রিয়া আছে। তা ছাড়া প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সমস্যা তো ছিলই। তাই সব জড়িয়ে বাংলার নাম 'সমস্যা-প্রদেশ'—স্বাধীনতার আগে ও পরে।

মধ্য যুগের ঐতিহাসিক ধারায় বিপত্তি ঘটাল বিদেশীর আকস্মিক প্রভুত্ব। সামাজিক বিপ্লব দেশীয় পরিস্থিতির মাধ্যমে না এসে এল বৈদেশিক শাসন ও শোষণের মধ্য দিয়ে। এই বিকৃতি আহত করেছে বাংলাকেই বিশেষ করে। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ আজো বাংলার সমস্যার ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে। একদা রাজা-গোপালাচারি বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতের দেহকে অঙ্গচ্ছেদের দ্বারা সুস্থ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের জটিলতা যে এত সহজে সরল হয় না তারও প্রমান? পাওয়া গেল যখন মাউণ্টব্যাটেন্-পরিকল্পনার আগেই মূলত অর্থনৈতিক নাড়ীর টানে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সর্বভারতীয় সহযোগিতা দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু বঙ্গবিভাগ যেমন হয়েছিল এক সমস্যা মেটাতে, বিভাগ আবার তেমনি জন্ম দিয়েছে হাজার সমস্যার আর এদের প্রায়

প্রত্যেকটির সঙ্গে সারা ভারতের ব্যাপক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। সমস্যা অবশ্য বিভক্ত পঞ্জাবেও আছে। কিন্তু যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতের ভাগ হয়েছে তারই চরম পরিণতি দেখি পঞ্জাবে। তাই আজ আর সেখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নেই। কিন্তু সেই সমস্যা বাংলায় আজও রয়েছে ; পূর্ব বঙ্গের হিন্দু ও পশ্চিম বঙ্গের মুসলিম আজো পূর্ব ও পশ্চিমকে একেবারে আলাদা হতে দেয়নি। তবে এটা ঠিক যে বৃটিশ শিকারী ভারত-বিহঙ্গের পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি পক্ষ ছেদ করে তার ওড়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে ; আর দুই ডানার দুই টুকরো হয়েছে পাকিস্তান। এই পাকিস্তানের জন্মদাতা জিন্নাই অনেকদিন আগে বলেছিলেন যে ভারত-ত্যাগের সময়ে ইংরেজের চেষ্টা ও চিন্তা হবে : 'প্লাবন আসুক আমাদের পরে।' আর ইতিহাসের মর্মান্তিক বিদ্রূপ এই যে, সেই প্লাবনের ধ্বংসে জিন্নাকেই অংশ নিতে হয়েছে।

দুই

পশ্চিম বঙ্গই বাংলার প্রাচীনতম অংশ। এর চেয়ে উর্বর পূর্ব ও নিম্ন বঙ্গ পলিমাটি থেকে জেগে উঠেছে অনেক পরে। পলিমাটির দেশ বলে এখানে নদী ও খালবিলের প্রাচুর্য। বাংলার জীবন রয়েছে তার নদীতে আর তার নদীর 'ব'-প্রদেশ ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে উঠছে আর পড়ছে। জলের সঙ্গে স্থলের বিপ্লব ও পরিবর্তন তাই বাঙালী জীবনের একটি প্রধান সমস্যা। এক সময়ে গঙ্গানদীর মূল প্রবাহ মেদিনীপুর অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছিল ; তাই হাজার বছর আগেও তাম্রলিপ্ত বা তমলুক ছিল পূর্ব ভারতের প্রধান বন্দর। মধ্য যুগের প্রথম দিকে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে সরস্বতী নদীর নির্জীবতা ঘটাল সপ্তগ্রামের অপমৃত্যু। 'ব' প্রদেশের নদী পরিবর্তনশীল আর তাই সত্তেরো শতকে গঙ্গানদী ভাগীরথীর

প্রবাহ ছেড়ে চলল পূর্ব দিকে; ফলে, রূপনারায়ণ নিষ্প্রাণ হল আর জেগে উঠল জলাঙ্গ, মাথাভাঙা আর গড়াই। আঠারো শতকের শেষার্ধে দামোদর ত্যাগ করল ভাগীরথীকে; নদীবিপ্লবে প্রবল হল তিস্তা, যমুনা ও কীর্তিনাশা। আজ ছ শো বছর ধরে গঙ্গা নদী চলেছে পূর্ব দিকে বেয়ে—পুরানো বন্দর, শহর আর গ্রাম হয়েছে প্রাণহীন, এসেছে ধ্বংস আর পরিবর্তন। মানুষ জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে ডেকে এনেছে প্লাবন আর পলিমাটিকে, 'ব'-প্রদেশের নদীর সর্বনাশা প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলায় নদীবিপ্লবের দীর্ঘ ইতিহাসের পরিচয় মেলে মানচিত্রের তুলনায়—ভ্যান্ ডেন্ ব্রুক্ আর আইজ্যাক্ টিরিয়ানের মানচিত্র আর আধুনিক বাংলার ছবি থেকে।

যুগে যুগে ধ্বংস আর পরিবর্তন, অরণ্যের জাগরণ আর প্লাবনের সর্বনাশ, ম্যালেরিয়া-ব্যাধি আর জীবনীক্ষয়, কৃষ্টি-সংকট আর অর্থনৈতিক সমস্যায় বাঙালী জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ১৯৩০ সালে এক কমিটি স্থির করলেন যে প্রতিকারের আর কোন উপায়ই নেই; মধ্য বঙ্গ আবার জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিণত হবে। আবার একজন বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন যে গঙ্গা নিজেই পুনরায় আশীর্বাদ করবেন: ভৈরব, জলাঙ্গ ও মাথাভাঙার পথে তাঁর আশীর্বাদের ধারায় আবার বাংলা বেঁচে উঠবে। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের নদীর অধোগতিই পূর্ববঙ্গের বন্যার প্রধান কারণ। পদ্মার বিপুল জলস্রোত ও মেঘনার গতি রোধ করে প্রবাহকে ঘুরিয়ে না দিলে পূর্ব ও পশ্চিমে ধ্বংসের হাহাকার উঠবে।

কিন্তু আমেরিকা ও রাশিয়ায় মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 'ব'-প্রদেশের নদীর ধ্বংসলীলা রোধ করেছে, জলনিয়ন্ত্রণ ও বাঁধের দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। বাংলার বিপুল জলসম্পদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হলে ম্যালেরিয়া তো দূর হবেই; তা ছাড়া কৃষির উন্নতি আর জলবৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে

নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটবে। আজ বাংলার এই উন্নতি বা অবনতির সমস্যা পূর্বে ও পশ্চিমে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। দীর্ঘ কাল ধরে পশ্চিমের অবনতি পূর্বের সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে, কিন্তু তারও. একটা সীমা আছে নানা কারণে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার যুক্ত প্রচেষ্টায় উভয়েরই উন্নতির সম্ভাবনা। নদীমাতৃক বাংলা দেশকে কৃত্রিম উপায়ে ছুটি বিরোধী রাষ্ট্রে ভাগ করা যায় না। প্রাকৃতিক কারণে ছু পক্ষকেই পরস্পর নির্ভর করতে হবে। শুধু দামোদর পরিকল্পনায় সমস্যার সমাধান হবে না। পূর্ব বঙ্গেরও গুরু-দায়িত্ব রয়েছে।

তিন

ইংরেজী আমলে ১৭৬৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এক সঙ্গে ছিল; ১৮২৬ সালে এদের সঙ্গে জুড়ে গেল আসাম, আবার আলাদা হল ১৮৭৪ সালে। এই চারটি প্রদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাক্-ইংরেজ যুগেও ছিল; এদের অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গভীর। এই প্রদেশগুলির সীমানা কিন্তু আজও কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়নি। ইংরেজের রাজত্বে সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে নানা কারণে, বিশেষত বিভেদনীতির তাগিদে। বাংলার নানা অঞ্চল নানা ভাবে বিহার ও আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বাঙালীর দ্রুতবর্ধমান শক্তিকে খর্ব করবার জন্য ও প্রাদেশিকতার মধ্য দিয়ে ভাঙনের বীজ বপন কববার উদ্দেশ্যে।

আসাম যখন বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হল তখন সে নিয়ে গেল কাছাড় ও শ্রীহট্ট। কিন্তু কাছাড়ের ছয় লক্ষ লোকের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লক্ষ ও খাঁটি আসামীর সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। শ্রীহট্টের ২৮লক্ষ লোকের মধ্যে বাঙালীরা ছিল সংখ্যায় ২৬

লক্ষ আর আসামীয়া সংখ্যায় ২ হাজার। আসাম-উপত্যকাতেও বিশেষত গোয়ালপাড়া ও নওগাঁতে, বাংলাভাষাভাষীদের সংখ্যা প্রবল। সমস্ত আসাম প্রদেশেই আসামীভাষাভাষীদের সংখ্যা বাংলাভাষাভাষীদের অর্ধেক। অবশ্য বর্তমানে শ্রীহট্টের অনেকটাই পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। শ্রীহট্টের অবশিষ্ট অংশ, কাছাড়, ত্রিপুরা ও মণিপুর নিয়ে পূর্বাচল প্রদেশ (প্রায় ১৫,০০ বর্গমাইল) অনায়াসেই গঠন করা যেত—যেমন গঠিত হয়েছে হিমাচল প্রদেশ।

১৯১২,সালে বাংলার কয়েকটি অঞ্চল বিহারে চলে যায় অনেক আপত্তি সত্ত্বেও। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের ২৯০ ধারায় আবার যুক্ত করবার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু তখন কোনো চেষ্টা হয়নি নানা কারণে। মানভূম জেলা ও সিংভূম জেলার ধলভূম অঞ্চলেই বাংলার দাবি সব চেয়ে বেশী—মোট ৫,৩০০ বর্গমাইল জায়গায়। মানভূমের লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে কুড়ি লক্ষ; তার মধ্যে বাঙালী সাড়ে বারো লক্ষ, হিন্দীভাষী সাড়ে তিন লক্ষ, বাকী আদিবাসী। ধলভূমে বাঙালী শতকরা ৫৭ জন; জামসেদপুর বাদ দিলে শতকরা ৬২ জন। পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ অঞ্চলে গ্রিয়ার্স ন্ সাহেবের মতের ভিত্তিতে বাংলাভাষাভাষীদের সংখ্যা হয় শতকরা ৯৭ জন; কিন্তু এই অঞ্চলের উপর বাংলার দাবি দুর্বল করবার জন্য বৃটিশ সরকারের আদেশে ১৯২১র লোকসংখ্যাগণনায় কিষণগঞ্জী ভাষাকে হিন্দী ভাষা হিসাবেই ধরা হয় এবং তার ফলে বাংলাভাষাভাষীদের সংখ্যা কমে ৬ লক্ষ। এ ছাড়া সাঁওতাল পরগণার কয়েকটি অঞ্চলেও বাংলা ভাষার প্রতিপত্তি রয়েছে। বিহারের আদিবাসীদের মধ্যে বাঙালীদের সম্পর্ক বিহারীদের চেয়ে বেশী, বাংলা ভাষার প্রচলনও। তা ছাড়া সমাজবিন্যাস, আচার-প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপারেও আসাম ও বিহারের অঞ্চলগুলি বাংলায় যুক্ত হবার দাবি রাখে। সেরাইকেল্লা, খরসোয়ান, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অধুনালুপ্ত দেশীয় রাজ্যগুলির কয়েকটি অংশও বাংলায় যুক্ত

হতে পারত। কিন্তু সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ানকে উড়িষ্যার সঙ্গে যোগ করেও কংগ্রেস সরকার পরে দুটিকে অযৌক্তিক ভাবে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

অথচ একাধিক বার কংগ্রেস বলেছেন যে ভাষার ভিত্তিতেই প্রদেশের সৃষ্টি বা প্রদেশের সীমানা নির্ধারণ হবে। বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চলের দাবি অনস্বীকার্য। পূর্ববঙ্গ থেকে আশ্রয়প্রার্থী হিন্দুরা দলে দলে এসে গেছে। ক্ষুদ্র পশ্চিম বঙ্গে বর্তমান লোকসংখ্যার উপযোগী স্থান ও সম্পদ নেই। অবশ্যম্ভাবী অসন্তোষ ও বিক্ষোভ তাই শুধু বাংলা নয় সারা ভারতের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে। বর্তমান ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের যোগ নেই; পূর্বাচল প্রদেশ হলেও এ সমস্যার সমাধান হত এবং পাকিস্তান সীমানার হাঙ্গামাও কমত।

চার

১৯০৫র বঙ্গবিভাগ এনেছিল জাতীয়তাবোধ ও সারা ভারতের রাজনৈতিক চেতনা; ১৯৪৭র বংগবিভাগ আনল জাতীয়তার অপমৃত্যু ও সারা ভারতের ভবিষ্যৎ অবনতির সম্ভাবনা। ১৯০৫র বঙ্গ-বিভাগের মূলে একটা ভৌগোলিক ভিত্তি ছিল; ১৯৪৭র বঙ্গ-বিভাগের মূলে রয়েছে মারাত্মক সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪৭র ১৫ই অগস্টের কয়েকদিন পরেই র‍্যাড্ক্লিফের আজব বিবরণী বেরোল। যারা একদিন বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে গিয়ে সারা ভারতের জাতীয় চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল তারাই চাইল বাংলাভাগ—ইতিহাসের উপহাস! 'স্বাধীন বঙ্গ' আন্দোলনে কেউ কর্ণপাত করেনি। কিন্তু র‍্যাড্ক্লিফের দুই বাংলা সত্যিই অপরূপ সৃষ্টি! স্কুলের ছাত্রও এমন একটা অযৌক্তিক ব্যাপার করতে পারত না। তা হলে র‍্যাড্ক্লিফ করলেন কেন? যুক্তি করেই, যুক্তিটা অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীর। দুটি

বাংলাকেই দুর্বল, অচল, সমস্যাজর্জর করে দেওয়া চাই আর সেই সূত্রে ভারত ও পাকিস্তানকেও।

১৯০৫এর দুটি বাংলার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক সীমানা ছিল; র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ দুটি রাষ্ট্রের মাঝে কোন সীমানা রাখলেন না—বিবাদ বাধাবার জন্য। তিনি হিন্দুপ্রধান খুলনাকে দিলেন পাকিস্তানে আর মুসলিমপ্রধান মুর্শিদাবাদকে টানলেন পশ্চিমবঙ্গে, যাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা না মেটে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণে কোনো সম্পর্ক রইল না, যাতে পরে বাঙালী ও অবাঙালীর মধ্যে বিরোধের সুবিধা হয়। পনেরোই অগস্ট্‌ খুলনা আর মুর্শিদাবাদ পতাকা তুলল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে; তার পরে ঘটল পতাকাবিভ্রাট। সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ জলপাইগুড়ি থেকে একটু দিলেন পূর্ববঙ্গে আর যশোর থেকে কাটলেন পশ্চিমবঙ্গে। দিনাজপুরের খানিকটা, নদীয়ার খানিকটা আর গোটা মালদহটাই দিয়ে ফেললেন পশ্চিমবঙ্গকে আর এই অবিচারের ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে মুসলমানহীন পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঠেলে দিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। বিভাগের ব্যবস্থা করে দেশে গিয়ে র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ কলকাতায় ইংরেজের স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেন। তাঁর ব্যবস্থায় কেউ খুশী হল না; বোঝা গেল তা হলে সুবিচার হয়েছে।

সুবিচারের ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সংখ্যায় তুচ্ছ নয়, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরাও নয়। তা হলে বিভাগে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হল কোথায়? পূর্ববঙ্গ কৃষিপ্রধান; পশ্চিমবঙ্গ শিল্পপ্রধান। পূর্ববঙ্গে গেল পাট, অনেকটা ধান, খানিকটা চা; পশ্চিমবঙ্গে রইল সমস্ত খনিজ সম্পদ, প্রায় সমস্ত কলকারখানা ও মিল, ব্যাবসা-বাণিজ্যের পূর্ণ ব্যবস্থা, শাসনযন্ত্রের কাঠামো আর মহানগরী কলকাতা। পূর্ববঙ্গের তিন দিক ঘিরে রইল ভারতীয় সীমানা, খোলা রইল জলপথ। পূর্ববঙ্গকে বাঁচতে হলে গড়ে তুলতে হবে প্রায় সব কিছু, পশ্চিমবঙ্গকে অনেক কিছু।

বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে এক বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মুসলমানদের চেয়েও অনেক বেশী উন্নত। এই দৃষ্টিকটু সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের কারণ যাই হোক এর ফলে হয়েছে শ্রেণীবিরোধ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেই মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুকে উৎখাত করে সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা আনবার একটা তীব্র প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। পূর্ববঙ্গবাসী পাকিস্তানী মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা শ্রেণীবিরোধকে মর্মান্তিক করে তুলছে। বাংলাভাগের সিদ্ধান্ত হবার পর থেকেই হিন্দুরা চলে আসছে এবং উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বসতি, খাদ্য ও জীবিকার ব্যবস্থা করা ক্ষীণশক্তি ও ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

পাঁচ

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সংখ্যায় অল্প এবং হিন্দুর চেয়ে সব বিষয়েই অবনত। ফলে, হিন্দুর ঈর্ষা ও মুসলমানের সামর্থ্য—এ দুয়েরই অভাব। সাম্প্রদায়িকতা তাই পশ্চিমে কম ও পশ্চিমবঙ্গ-বাসী মুসলমান কমই গেছে পূর্ব দিকে—গেছে ভয়ে নয়, জীবিকা-লাভের সুবিধার জন্য এবং অনেকে ফিরেও এসেছে নবগঠিত রাষ্ট্রের অসুবিধা ও অব্যবস্থার তাড়নায়। তা হলে দেখা গেল যে, পশ্চিমে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক প্রায় আগের মতোই রয়েছে; সমস্যা হয়েছে পূর্ববঙ্গবাসী আশ্রয়প্রার্থী নিয়ে। পূর্ব ও পশ্চিমের পারস্পরিক সমস্যাই প্রমাণ করে বিভাগের কৃত্রিমতা। তাই পুনর্বসতির সাময়িক ব্যবস্থা করলেও আসল সমাধান আসবে সমাজের বৃহত্তর পরিবর্তনে—যার ভিত্তি গড়বে আর্থিক ও সামাজিক সমতা। স্থানান্তরের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম দুই-ই বিপন্ন হয়েছে একাধিক কারণে। ক্রতবর্ধমান লোকসংখ্যার বসতি ও জীবিকার জন্যও স্থান

ও সম্পদের অভাব হবে। এখন থেকে ঘন বসতির বিবিধ সমস্যার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা না করলে শুধু বাংলা নয় সারা ভারতই বিপন্ন হবে। বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের ওপর দাবি তাই এই দিক দিয়েও যুক্তিসঙ্গত।

বাংলার মৌল সমস্যাগুলি আরও জটিল হয়ে উঠেছে বিভাগের ফলে। রাজনীতির দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী মুসলিম লীগ্ সর্বাধিপত্য করছে; প্রগতিশীল কোনো দল এখনো গঠিত হতে পারেনি। তবে তার যে সূচনা হচ্ছে তা বোঝা যায় নানা রকম বিক্ষোভ ও অসন্তোষের মধ্যে। পূর্ববঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানী নীতির প্রভাব 'বাঙালী' সমস্যাকে বর্তমানে ঢেকে রাখছে। কিন্তু অর্থনীতিগত বিক্ষোভ যত বাড়বে 'বাঙালী' সমস্যা তত বেশী মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে আর লীগ্-বিরোধী দলও ধীরে ধীরে গঠিত হবে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানও পূর্ববঙ্গে আছে—এ কথা ভুললে চলবে না।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলের অভাব নেই, আবার সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভাও আছে। নানা রকম সমস্যা ও দুর্ভোগের ফলে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাবও এখানে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। এর প্রভাব বাংলার ও ভারতের রাজনীতিতে অদূর ভবিষ্যতে স্পষ্টভাবেই দেখা যাবে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গণচেতনার অসমতার একটি মূল কারণ হচ্ছে পূর্ববঙ্গে কলকাতার মতো মহানগরীর অভাব; ঢাকা এ অভাব এখনো পূরণ করতে পারে নি। পূর্ববঙ্গে শ্রমশিল্পের অভাব; তাই ভবিষ্যতে আন্দোলন হবে চাষীদের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গে ঘন বসতির ফলে চাষীদের ওপর চাপ বেড়ে যাবে আর মজুর অসন্তোষের তো অভাব নেই। সুতরাং এখানে চাষী-মজুরের যুক্ত আন্দোলন চলবে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য। পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রগঠনের পর ক্রতবর্ধমান মুসলমান মধ্যবিত্ত আর্থিক সংকটের দিনে শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে না; আর

তা ছাড়া তাদের মধ্যে অনেকেরই মধ্যবিত্ত ঐতিহ্য নেই। পূর্ববঙ্গে সেইজন্য শ্রেণীবিরোধ বিশেষ প্রখর হতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত উন্নততর ও দৃঢ়তর। কিন্তু ১৯৩৯এর পর থেকে নানা কারণে বিশেষত আর্থিক বিপর্যয়ে এখানকার নিম্ন মধ্যবিত্ত এমন বিপন্ন হয়েছে যে, নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে তার পার্থক্য দিন দিন কমে আসছে। তা ছাড়া মধ্যবিত্তের মধ্যে বামপন্থী অসন্তোষ ধীরে ধীরে সাম্যবাদের আকার নিচ্ছে। এই সব ব্যাপারের মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে যে ঐতিহাসিক শক্তি পুঞ্জীভূত হবে তার আঘাতে আগামী যুগে বিপ্লবী পরিবর্তন হতে বাধ্য। র‍্যাডক্লিফের কৃত্রিম বিভাগের ভুল হয়তো এখানেই ধরা পড়বে; দু পক্ষের অসুবিধার ভিতর দিয়েই হয়তো জাগ্রত হবে শুভ সমাজবুদ্ধি ও রাষ্ট্রের কল্যাণ।

দূষিত ক্ষতের মতো বিভক্ত বাংলা শুধু নিজেই জর্জর হবে না, সারা ভারত ও পাকিস্তানকেও বিপন্ন করে তুলবে। কিন্তু সবার চেয়ে বড় কথা: দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়েও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি অবিরোধী ভাবেই অবস্থান। তার লক্ষণ স্পষ্ট এবং এখানেও বাঙালীর অখণ্ডতার প্রমাণ।

ছয়

আজ প্রায় আট শো বছর ধরে বাংলায় মুসলমানরা বাস করছে। ১৮৮১র লোকসংখ্যাগণনায় তারা হিন্দুকে প্রথম ছাড়িয়ে গেল; তার দশ বছর আগেও হিন্দু ছিল ১৮১ লক্ষ আর মুসলমান ছিল ১৭৬ লক্ষ। ১৯৪১এর গণনায় দেখা গেল হিন্দু আড়াই কোটির কিছু বেশী আর মুসলমান সাড়ে তিন কোটির কিছু কম। ৬০ বছরে হল এই বিরাট সংখ্যাবৈষম্য এবং এর ফলে যে সমগ্র জাতীয় জীবনে পরিবর্তন আসবে তা তো বোঝাই যায় সহজে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা উচিত। সংখ্যার হার মুসলমানদের বাড়ছে কিন্তু হিন্দুর

কমছে। এরই জন্য প্রশ্ন উঠেছে : 'বাঙালী হিন্দু কি ক্ষয়িষ্ণু?' সাম্প্রদায়িক তুলনায় এই সংখ্যাহ্রাস দৃষ্টিকটু হতে পারে কিন্তু হিন্দুর সংখ্যাহার এমন কিছু নয় যে তার জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে; শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই কর্তব্য শেষ হয় না। অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধিরও হাজার রকমের সমস্যা আছে। মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে—বহুবিবাহের রীতি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে, বিধবাবিবাহের প্রথা, বাল্য-বিবাহ, দায়িত্বজ্ঞানহীন অতিপ্রজনন, নিম্নবর্ণ কর্মঠ হিন্দুর মতো প্রজনন শক্তির প্রাচুর্য। হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের কারণ হচ্ছে—উচ্চবর্ণ হিন্দুর মধ্যে জন্মনিরোধ রীতি, উচ্চবর্ণের পরিণত বয়সে বিবাহ ও বিবাহে অনিচ্ছা বা আর্থিক অসামর্থ্য, বিধবাবিবাহের ও বহুবিবাহের অভাব, অতিরিক্ত জাতিভেদ ও শ্রেণীবিভাগের ফলে জীবনীশক্তির দুর্বলতা ও বিবাহের স্বল্পতা।

যাই হোক, বর্তমানে সংখ্যাবৈষম্য অনেক সমস্যাই জাগিয়ে তুলেছে। প্রথমেই তো নজরে পড়ে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক পার্থক্য। এর সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিচার করলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবিরোধের সম্ভাবনা সহজেই বোঝা যায়। কুচক্রী ও অনুদার লোকেরা (বিদেশী, হিন্দু ও মুসলমান) তাই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক ও প্রগতিবিরোধী আন্দোলন চালাতে সুবিধা পেয়েছে ও পাবে। হিন্দুর অনুদার সমাজপ্রথা এবং মুসলমানের গোঁড়ামি, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবল করে তুলেছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা না থাকলে সমস্ত ভারতেরই ইতিহাস খানিকটা বদলে যেত।

আয়তনের তুলনায় দ্রুতবর্ধমান লোকসংখ্যা বাংলাকে বেশ বিপন্ন করেছে। বাসস্থান, খাদ্য, জীবিকা ও উপযুক্ত অর্থের এবং সমাজের ব্যবস্থার অভাবে এই বিরাট জনতা দারিদ্র্যে ও বিরোধে, অন্নাভাবে ও আত্মকলহে অমানুষ হয়ে ভারতে ও পাকিস্তানে ভীষণ বিপদের সৃষ্টি করবে। 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'র আর বৃদ্ধিতে প্রয়োজন নেই; 'বর্ধিষ্ণু

মুসলমান'কেও সংখ্যাহার কমাতে হবে। কুচক্রী ও কুশিক্ষিত লোকের পরামর্শে যদি এরা সংখ্যাবৃদ্ধিব্রতে মনপ্রাণ নিবেদন করে তা হলে দু পক্ষেরই সমূহ সর্বনাশ।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে দেখতে হবে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সংযতভাবে :

> ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক না করলে ধর্ম আর ধর্মই থাকে না, বড় একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়···আনুষ্ঠানিক ধর্মের দৃষ্টি স্বভাবতই অতীতের দিকে; পক্ষান্তরে, বর্তমান যুগের বিশ্বমানবের দৃষ্টি হল ভবিষ্যতের দিকে।···অনুষ্ঠানমুলক সামাজিক ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভূষিত করার অর্থ হচ্ছে প্রগতির সর্ববিধ পথকে অর্গলবদ্ধ করা।···আনুষ্ঠানিক ধর্মের সব চেয়ে দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, তার প্রকৃতি হল মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা, মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভক্ত করা এবং সেই গণ্ডীগুলিকে ধর্মের আকার দিয়ে চিরস্থায়ী করে তোলা। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই এই পথে গিয়েছে···ইউরোপ ভূখণ্ডে ধর্মরাষ্ট্রের অবসান ঘটছে আর প্রাচ্যের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিও দ্রুত সেই একই পথে অগ্রসর হচ্ছে।
>
> —ওয়াজেদ আলি : ভবিষ্যতের বাঙালী

এই কয়টি কথা মনে রাখলেই বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিগত ধর্মমত বজায় রেখেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দুত্ব বা ইসলাম বর্জন করে খাঁটি বাঙালী হবে।

কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণগুলি কী?

(১) অর্থনীতির বৈষম্য দুই সম্প্রদায়ে; (২) শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার দোষ; (৩) ধর্মগুরুদের সাম্প্রদায়িক প্রভাব; (৪) শ্রেণীবিরোধের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা; (৫) দুই

সম্প্রদায়ের ধনী ও মধ্যবিত্তদের অর্থনীতিগত প্রতিযোগিতা ও তার প্রভাব রাষ্ট্রীয় জীবনে; (৬) সামাজিক ভেদাভেদ ও যৌথ জাতীয় অনুষ্ঠানের অভাব; (৭) ইংরেজের বিভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িক অবাঙালীদের অবাঞ্ছিত প্রভাব; (৮) অতীতের সাম্প্রদায়িক গৌরবের স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কল্পনা। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এত বিদ্বেষ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও 'স্বার্থান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনো আছে আর ভাবীকালেও থাকবে।' (ওয়াজেদ আলি)।

কিন্তু এখন উপায় কি? প্রথমেই অর্থনীতির বিরোধ দূর করার জন্য সর্ব রকমের প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষা ও প্রচারকার্য এবং রাজনীতিগত আন্দোলনের দ্বারা সুস্থ গণচেতনার সৃষ্টি করতে হবে। 'এ কাজ হিন্দুদের মধ্যে কতকটা অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মোটেই হয়নি। তাই মুসলমানদের মধ্যে হাতুড়ে রাজনীতিকদের প্রভাব এতো বেশী। মুসলমানের শিক্ষার দৈন্য এবং রাজনৈতিক চেতনার অভাব আজ সমস্ত দেশকে বিপন্ন করে তুলেছে' (ওয়াজেদ আলি)। সংস্কারমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ অশিক্ষা ও কুশিক্ষা সত্ত্বেও বাঙালীর কাছে সংস্কৃতির একটা স্বাভাবিক আবেদন আছে যা অন্য ভারতীয়দের কাছে এতটা নয়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-অনুষ্ঠানগুলির মূল্য কমিয়ে যৌথ জাতীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ধারা গড়ে তুলতে হবে। সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে সামাজিক ভেদাভেদ—এ দিকে হিন্দুরই দায়িত্ব বেশী। নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই বাংলার লোককে হিন্দু-মুসলমানত্ব ছেড়ে বাঙালী হতে হবে।

পল্লীসমাজে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাহ যদি ধর্মান্তরগ্রহণসাপেক্ষ না হয় তাহা হইলে ইহা সামাজিক শান্তি

ও সদ্ভাবের পরিপোষক হয়।…বিবাহ অসম্ভব হইয়াছে শুধু সামাজিক অনুশাসনের জন্য।

—রাধাকমল মুখোপাধ্যায় : বিশাল বাংলা

বাঙালী জীবনের এই মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক সমস্যা অবাঙালীর পক্ষে বোঝা নানা কারণে সম্ভব নয়। তাই বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে অবাঙালী হিন্দু বা মুসলমানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা বাঙালীর পক্ষে কোনো মতেই উচিত নয়। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, যৌথ জাতীয়তা ও সামাজিক উদারতার পথে এগিয়েছিল বলেই বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে অবাঙালীরা খাঁটি হিন্দু বা মুসলমান বলে অনেক সময়েই মনে করে না। বাঙালী মুসলমানের পক্ষে অবাঙালী মুসলমানের অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন, কারণ তার শিক্ষা ও অর্থবল নেই। তাই হিন্দুর দায়িত্ব বেশী।

সাত

বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ শ্রেণীই উচ্চ বর্ণের। অর্থনীতির ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরাই নেতৃস্থানীয় যদিও সংখ্যায় এরা নিম্ন বর্ণের চেয়ে অনেক কম। জাতিভেদের হাজার নিয়মে উচ্চ বর্ণ, নিম্ন বর্ণ ও এমন কি অস্পৃশ্যদের মধ্যেও বহু শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। প্রাচীন কালে জাতিভেদপ্রথার কোনো অর্থ ছিল কিনা তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে বর্তমান জীবনে এই রীতি শুধু অমানুষিক নয় বহু সমস্যার জন্য দায়ী। মধ্য যুগে নানা কারণে জাতিভেদ কঠোরতা লাভ করে। কিন্তু এই বিধিনিষেধ বাংলার মাটির স্বভাববিরুদ্ধ বলেই বোধহয় এর উৎপাতে বাংলার সর্বনাশ হতে চলেছে। তথাকথিত উচ্চ বর্ণেরা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে, কিন্তু নিম্ন বর্ণেরা শুধু বর্ধিষ্ণু নয়, এরা কর্মঠ ও একটা

জাতির অপরিহার্য জীবিকার সাধক। উচ্চ বর্ণের সামাজিক অত্যাচারে ও কুৎসিত অস্পৃশ্যতার উৎপাতে যুগে যুগে এরা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। এই প্রথা দূর করতেই হবে।

যে সমাজে নারীশক্তি নিপীড়িত, বিভ্রান্ত ও অচেতন সে সমাজের ভবিষ্যৎ নেই বললেই চলে। এতটা জনশক্তি রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতির জন্য নিযুক্ত হলে সারা দেশের অবস্থাই বদলে যাবে। এ দিকে কিছু অগ্রগতি দেখা গেছে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে, কিন্তু মুসলিম নারীসমাজে অবরোধ ও অশিক্ষা আজো প্রবল। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের কারাগার ভেঙে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায়, চিন্তা ও কর্মঠতায় বাঙালী মেয়েকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে হবে।

আট

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার অধোগতি হয়েছে কয়েকটা বিশেষ কারণে : (১) বাংলার লোকসংখ্যা বেশী কিন্তু কৃষিভূমির পরিমাণ সেই হিসাবে কম। একাধিক কারণে কৃষির দ্রুত অবনতি ঘটেছে, গোসম্পদেরও। (২) বাঙালীর খাদ্য নিকৃষ্ট—এতে পরিপোষণ-শক্তির অভাব স্পষ্ট। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাধির অত্যাচারে জীবনীশক্তিরও হ্রাস ঘটেছে। প্রাকৃতিক কারণেও বাঙালীর দৈহিক শক্তি ও সহনশীলতা সাধারণত কম। (৩) শিল্পী-শ্রমিক-ব্যবসায়ী-দলের বৃদ্ধি নেই ; তাই অর্থনৈতিক ব্যাপারে অবাঙালীর আধিপত্য বাংলার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। (৪) মেস্টন্-বাঁটোয়ারায় বাংলার তদানীন্তন ৫ কোটি লোকের জন্য কেন্দ্র থেকে ধার্য ছিল ১১ কোটি টাকা আর বোম্বাইয়ের ২ কোটি লোকের জন্য ছিল ১৫ কোটি টাকা। ফলে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে আর আয় কমেছে ; উন্নতির কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। (৫) ১৯৩৯এর মহাযুদ্ধে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাই হয়েছে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত।

সামরিক কেন্দ্র হিসাবে ও জাপানী আক্রমণের আতঙ্কে বাংলার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। যুদ্ধোত্তর চোরা কারবারের পৈশাচিকতাও যুক্ত হয়েছিল তার সঙ্গে। (৬) তার পর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বঙ্গ বিভাগ যার হাজার অকল্যাণের মধ্যে প্রধান হল উদ্বাস্তু সমস্যা।

ইংরেজের রাষ্ট্রীয় বসতি বাংলাতেই প্রথম। যাবার আগে তাই সে পরম আক্রোশে তার সাধের বাসা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।

কিন্তু এই ইংরেজ-পরিত্যক্ত ভারতের অভিশপ্ত বাংলা থেকেই গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতের বাংলা।

ওয়াজেদ আলি বলেন :

> আমাদের সামাজিক জীবন মধ্যযুগীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অতীতমুখী ; আর আমাদের রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষাগত আদর্শ হচ্ছে আধুনিক যুগের এবং ভবিষ্যন্মুখী।...আমরা জীবন্ত এবং মৃত চিন্তার মধ্যে প্রভেদ করতে শিখিনি।

মৃত চিন্তার পরিবর্তে জীবন্ত চিন্তার সাধনাই আনবে আমাদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিগন্ত।

দ্বিতীয় পর্ব

সমাজ ও সংস্কৃতি

১ বৈশিষ্ট্য

এক

একটা আদর্শ-সংঘাত বা একটা যুগ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জীবন-দর্শনের প্রকাশই হল মহাকাব্যের মূল কথা। রামায়ণের মধ্যে দেখি সেই বিরোধ, আর্যশক্তির সঙ্গে অনার্যশক্তির মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এই বিরোধ চিরন্তন হয়নি; রক্তের দিক দিয়ে এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি মিশ্রণে ও সমন্বয়ে। রক্তের শুদ্ধতার গর্ব তাই আজ ভারতবাসী করতে পারে না; করবার প্রয়োজনও নেই। আর্য, অনার্য, দ্রাবিড় ও মোংগল প্রভৃতি অনেক রকম রক্ত মিলেছে বাঙালীর দেহে, মনে এনেছে ব্যাপকতা। 'বহু মানবজাতির মিলনভূমি বলেই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙালীরা এত সচেতন।' এই রক্তমিশ্রণ বাঙালীকে দিয়েছে অনার্যের শিল্পকৌশল আর ভাবপ্রবণতা, আর্যের সংস্কৃতি আর তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি, মিশ্রণের উদারতা। বাঙালীর নৃতত্ত্বে জাতিসমন্বয়ের প্রাচুর্য তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি প্রধান কারণ।

আর্যপ্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে পূর্বভারত প্রায় একরকম অস্পৃশ্য বলেই গণ্য হত। আর্যসভ্যতা যতো বিস্তৃত হতে লাগল ততোই আর্যবিরোধী পলাতকেরা সরে এল বাংলার দিকে। বাংলার আদিম অধিবাসীরা আর্য ছিল না, কিন্তু তাদের মানস স্বাতন্ত্র্য ছিল; সভ্যতাও নিশ্চয় ছিল। পরাজিত মিশ্র অনার্যেরা ধীরে ধীরে আর্য সভ্যতা গ্রহণ করতে লাগল; ভাষাতেও প্রভাব দেখা গেল। কিন্তু আজো দৈনিক জীবনের নানারকম আচার-ব্যবহারে, অভ্যাস-অনুষ্ঠানে বাংলার আর্যবিরোধী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেমন দেখা যায় দাক্ষিণাত্যে।

বৈদিক সাহিত্যের নিষাদই হয়তো আদিম বাঙালী। কৃষি এদের প্রধান পেশা হলেও পাথর, তামা ও লোহার ব্যবহার এরা জানত। এরাই এনেছে ধানের চাষ, জলসেচ, পর্বতগাত্রে ক্ষেত্র-

নির্মাণ, সমাজবিন্যাসে পঞ্চায়েতী শাসন ও গ্রাম্যজীবনের সমূহতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতি। এদের কাছে আর্যেরা শিখেছিল অনেক লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ, সিঁদুর আর হলুদের ব্যবহার। বিতাড়িত অনার্য জাতিরা নতুন কৃষ্টির গোড়াপত্তন করেছিল। এদের মধ্যে অনেকে আর্যীকরণের যুগে উচ্চ পর্যায়ে উঠে গেল বোধ হয় শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয়ে, আর কেউ বা রইল অনুচ্চ শ্রেণীতে। আর্যদের দ্বারা অত্যাচারিত বহু জাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে খানিকটা প্রজাতন্ত্রমূলক এক গ্রাম্য সমাজ গড়ে তুলেছিল।

দুই

বাংলার কোমল মাটি যুগে যুগে বিদেশীকে আকর্ষণ করে এক পরিবর্তনশীল সমাজ সৃষ্টি করেছে; নতুন ভাবধারার প্রয়োজন তাই বাঙালীর জীবনে এতো বেশী হয়েছে। কিন্তু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ পরিবর্তনের সৃষ্টি করলেও সংগঠনের দিক দিয়ে অনেক সময়ে হয়েছে ক্ষতিকর। ধৈর্য ও দৃঢ়তা তার কম। শ্যামল, কোমল প্রকৃতি তাকে করেছে ভাববিলাসী; তাই মনোজগতে চিন্তার ক্ষেত্রে তার বৈশিষ্ট্য থাকবেই, কিন্তু কঠিন ও নীরস কর্মক্ষেত্রে তার পরাজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাঙালীর জীবনের সঙ্গে তার দেশের নদীগুলির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। নদীর জল তাকে শুধু পরিপুষ্ট করেনি, গতিপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সমগ্র জীবনে বিপর্যয়ও এনে দিয়েছে। ভাগীরথী, সরস্বতী, যমুনা, পদ্মা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র—এই নদীগুলির ও তাদের শাখার অল্প-বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে নদীর ব-প্রদেশের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উত্থান-পতন। তাই যুগে যুগে বাংলার নদী বাংলাকে আর বাঙালীকে নতুন করে গড়েছে আর ভেঙেছে। কতো বর্ধিষ্ণু শহর, গ্রাম, বন্দর, লোকালয়, সমাজ ও

কৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে ; ইতিহাসের কতো অধ্যায় লুপ্ত হয়ে গেছে নদীর চরে, নদীর জলে, জঙ্গলে আর মাটির তলায়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভ্যান ডেন ব্রুকের মানচিত্র বা ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আইজ্যাক টিরিয়ানের মানচিত্রের সঙ্গে বাংলার বর্তমান ছবি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে কী নিদারুণ নদী-বিপ্লব এ দেশে ঘটে গেছে। উত্তর ভারতে এ রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়নি, আর হয়নি বলেই সমাজ ও মনের দিক দিয়ে প্রভেদ রয়ে গেছে। নদীর মৃত্যু বা গতিপরিবর্তনের সঙ্গে বাঙালীর সমাজ ও বাঙালীর মনের গূঢ় সম্পর্ক আছে। নদীই এনেছে অনেক সময়ে তার সমাজে প্রগতি, তার মনকে করেছে সচেতন ও দুঃসাহসী, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তার উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রখর।

> নদী যেখানে কীর্তিনাশা মানুষ সেখানে নিত্য নূতন কীর্তি অর্জন করে। তাই কোনো কীর্তিনাশা বাংলার নিজস্ব কীর্তিকে নষ্ট করিতে পারে নাই।...বারভুঁইয়াদের সাহস ও স্বাধীনতা-প্রিয়তাকে উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছিল একমাত্র পদ্মা ও মেঘনার নির্মম ভাঙা-গড়া।
>
> —রাধাকমল মুখোপাধ্যায় : বাংলা ও বাঙালী

ভৌগোলিক ঐক্য প্রাচীন যুগে ছিল না, ছিল বিভিন্ন অঞ্চল—উত্তর বঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত ; দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে ছিল বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বংগাল ; এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের খানিকটা নিয়ে ছিল গৌড়। ভাষাসাম্য থাকলেও কোনো একটি ভাষা সর্বত্র প্রচলিত ছিল না।

> দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের লোহিত বন্ধুর উপত্যকা ও তালীবনবেষ্টিত সাগরকূলের বালেশ্বর, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের সানুদেশে ভাগলপুর ও পুর্ণিয়া, পূর্বদিকে আসামের সুর্মা নদী ও

ব্রহ্মপুত্র নদের বিপুল বারিধারা-প্লাবিত সমতল উদ্যান ও স্নিগ্ধ বনানী বাংলার সীমানা। বাংলার ইহাই প্রাকৃতিক পূর্ণাবয়ব।

—রাধাকমল মুখোপাধ্যায় : বিশাল বাংলা

তিন

ভারতীয়তা থেকে বাঙালীত্বকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সংগত নয়, সম্ভব নয়, বৈশিষ্ট্য স্বীকার করলেও।

ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের অন্যজাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে সেই সব বিষয় বাঙ্গালীদের সমতা আছে।

— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

বিভিন্ন প্রদেশের বা অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় হয়েছে ভারতীয়তায়। এই ভারতীয়তা নিছক কল্পনাবিলাস নয়, একটা বাস্তব সত্য যা প্রত্যেক ভারতবাসীই জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অনুভব করে রক্তে ও হৃদয়ে।

সভ্যতা হচ্ছে মনের বস্তু। সুতরাং এ কথা যদি সত্যও হয় যে প্রাচীন আর্যদের সঙ্গে বাঙ্গালীর রক্তের সম্পর্ক এক পাই, তাহলেও আর্যসভ্যতার সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুর মনের সম্পর্ক পোনেরো-আনা৷৹ তিন-পাই। ... আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমগ্র ভারতবর্ষে একটি ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করতে পারেননি—legal হিসাবেও নয়, spiritual হিসাবেও নয়। এক মোটামুটি শীলগত ঐক্য ছাড়া তাঁরা অপর কোনো বিষয়ে ভারতবাসীদের ঐক্য স্থাপন করতে পারেননি।

—প্রমথ চৌধুরী : নানা কথা

এই শীলগত ঐক্যের অংশীদার আমরা, আর আমাদের রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্য। শেষোক্ত ঐক্যটি বর্তমানে অত্যন্ত প্রবল। মুসলমানী আমলে এটির ভিত্তিস্থাপনের চেষ্টা হলেও স্বীকার করতেই হবে যে এর অনেকটাই ইংরেজের সৃষ্টি। এইখানেই নয়া ভারতের গোড়াপত্তন, নয়া বাংলারও।

চার

এ কথাও ঠিক যে, ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক জাতিরই স্বতন্ত্র প্রতিভা, স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। আসামী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই? ভারত যদি হয় 'সাধারণ' এবং বাংলা যদি হয় 'বিশেষ' তাহলে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না। একবার ব্রজেন্দ্র শীলের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন :

> বীজমাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণ-ধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে।...বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবনসাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশী করেই দিয়েছেন। ...এজন্য এই দেশকে আজ পর্যন্ত কম দুঃখ সইতে হয়নি। প্রাণের নামে, মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে। ...উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনা-ক্ষেত্রে। ...কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নেই। বাংলা দেশের এই উদার বিস্তৃতির ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে। তার শিল্পে, সংগীতে, সাহিত্যে, সাধনায়। প্রাণী যেমন নানা খাদ্য হতে নানা প্রাণরস নিয়ে জীবনে সমীকৃত করে তেমনি নানা উপকরণ দিয়ে বাংলা দেশ তার শিল্প ও কলাকে জীবন্ত করে তুলেছে। বাংলা দেশের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে

সুকুমার সূক্ষ্মতাবোধ। যে দরদী হাতে মসলিন সুতোর সৃষ্টি সেই হাতে বাংলার বহু সুকুমার শিল্প গড়ে উঠেছে। মাধুর্যের সঙ্গে এ দেশের চির যোগ। ...সে ভালো 'বেনে' না হতেও পারে কিন্তু তার দেশ বিস্তৃত বলে তার দৃষ্টি উদার হবারই কথা। ...বাংলা দেশ যে দেবভূমি নয়, এ দেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে।

--ক্ষিতিমোহন সেন : বাংলার সাধনা

এই হল বাঙালীর মানসক্ষেত্রের বিশেষত্ব বা ব্যাপক অর্থে 'আধ্যাত্মিক' বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া বাস্তব জীবনেও তার বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথম যে বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে ভাষাগত ঐক্য।...দ্বিতীয়ত এ দেশের বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে মোটামুটিভাবে এমন একটা কুলগত ঐক্য আছে যেজন্য কে কোন ধর্মের লোক সহজে তা বোঝা যায় না। · বাঙালী শান্তিপ্রিয়...বাঙালী বুদ্ধিমান, ভাবপ্রবণ...ধর্মের বিষয়ে সে উদার মত পোষণ করে···নূতনের প্রতি একটা স্বাভাবিক ভালোবাসা বাঙালী তার অন্তরে পোষণ করে।·· কায়িক পরিশ্রমের চেয়ে ভাবের চর্চাই বাঙালীর বেশী প্রিয়। · বাঙালী জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সমস্যা এক। আর বাঙালীর অর্থনৈতিক স্বার্থ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে ভিন্ন।···এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের প্রভুত্বের সমস্যা প্রকৃত পক্ষে এদেশে ওঠে না।···বাংলা দেশে এমন এক কৃষ্টি এসে দেখা দিয়েছে যার দৃষ্টি স্বভাবতই ভবিষ্যতের দিকে এবং বিশ্বমানবতার দিকে।...গণতান্ত্রিক ভাব ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে অনেক বেশী গভীর এবং ব্যাপক।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক।

—ওয়াজেদ আলি : ভবিষ্যতের বাঙালী

পাঁচ

আর এক ভাবে দেখা যাক—বিশেষত উত্তরাপথ বা আর্যাবর্ত ভারতের সঙ্গে তুলনা করে। বহুজাতির সমাগম ও রক্তমিশ্রণের ফলে বাঙালীর মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্যের চেয়ে শ্রেণী-সমন্বয় বেশী স্পষ্ট। বাংলাদেশেই বর্ণসংকর জাতির উদ্ভব প্রচুর। এর ফলে বাঙালীদের মধ্যে একটা সহজ সাম্য ও ঐক্যবোধ আছে যা খাঁটি আর্যের জাতিভেদপ্রথার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হলেও নষ্ট হতে পারেনি। বাঙালীর ব্যক্তিত্ববোধ ও মানবতার মূল্যবোধ তার মনকে করেছে উত্তর ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক ; তাই তার পারিবারিক জীবন, ব্যবহারশাস্ত্র, সমাজনীতি, ধর্মপদ্ধতি ও সাধনা আর্যরীতি থেকে বহুধা ভিন্ন। উত্তর ভারতের সমাজে একটা সনাতন ধারা রয়েছে, বাংলার মতো নমনীয়তা ও পরিবর্তনশীলতা নেই। বাংলার সমতলভূমিতে রাজনৈতিক যুগবিপ্লব বাধা পায়নি ; অভিযানের স্রোতে বেতস-বৃত্তি অবলম্বন করে বাঙালী নিজের সমাজে সময়োপযোগী পরিবর্তন চালিয়ে গেছে ; উত্তর ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে বিপর্যয় হয়েছে, কিন্তু গ্রাম্যজীবনে বিশেষ কোনো বিকার ঘটেনি। বন্ধুর, কঠিন, উদাসীন, অনাসক্ত প্রকৃতি বার বার বাধা দিয়েছে, প্রতিরোধ করেছে নতুন আন্দোলনকে ; সামরিক আলোড়নের বলি হয়েছে সনাতনী প্রতিক্রিয়ার বেদীতে। তাই ভারতের উত্থান-পতনের মধ্যেও প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজরীতি চিরন্তন দৃঢ়তা নিয়ে আজো সেখানে বর্তমান।

সব যুগেই বাংলায় বড় বড় শহর ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণে কাশী, পুনা, লাহোর, দিল্লি

ইত্যাদির মতো প্রাচীন বা স্থায়ী নগর এখানে গড়ে উঠতে পারেনি। তাই বাঙালীত্ব প্রধানত গ্রাম্য জীবনের ওপরই নির্ভর করেছে; আর গ্রাম্য জীবন বিপন্ন হলেই বাঙালীত্ব বিপন্ন হয়েছে বার বার, তার রূপান্তর হয়েছে বার বার। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীর মন প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু আধুনিক বাঙালী তার পূর্বপুরুষ থেকে অনেক বিষয়েই ভিন্ন। এই প্রগতিশীলতা বাঙালীর জীবনে অতি স্বাভাবিক ভাবে ঐতিহাসিক কারণেই এসেছে। একে তার উন্নতি বা অবনতির লক্ষণ বলে অভিহিত না করে বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করাই বোধ হয় যুক্তিসংগত হবে।

যাই হোক, বাঙালীর যে অখণ্ডতা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখন আমরা পূর্ণবিশ্বাসী সে বস্তুটি কিন্তু প্রাচীন যুগে অসম্পূর্ণ ছিল। ভাষাগত ও জাতিচৈতন্যগত ঐক্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং মধ্য যুগে বা মুসলমান অধিকারের সময়েই বেশ পুষ্টি লাভ করে। অর্থাৎ মুসলমান আমলেই বাঙালীর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। কোনো বিরোধ বা বিপ্লবই আজ পর্যন্ত সেই অনুভূতিকে নষ্ট করতে পারেনি।

এক

ভারতীয় তথা বাঙালী সমাজের রূপ ও রূপান্তরের দীর্ঘ ধারায় একটা অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়; আর তার পরিচয় মেলে গ্রাম্য সমাজে। অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে অনেক এবং নানা কারণে বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্যও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশেষত ইংরেজী আমলে।

প্রাচীন সমাজের মূল সূত্রগুলি কী? জৈমিনি বলেছেন: 'রাজা জমির মালিক নন; মালিক তারা যারা চাষ করে।' সায়নাচার্যেরও একই কথা অর্থাৎ রাজার শুধু রাজস্ব আদায়ের অধিকার, জমির আসল মালিক চাষী। ফলে সমাজ হল মূলত কৃষিপ্রধান ও পল্লী-কেন্দ্রিক।

আর একটি বৈশিষ্ট্য কার্ল মার্ক্সের মতে: 'সহজ সরল অর্থনৈতিক উৎপাদনরীতির পুনরাবর্তন হচ্ছে এই আত্মনির্ভরশীল গ্রাম্য সমাজের বিশেষত্ব।...রাজ্য ও রাজবংশের অফুরন্ত ভাঙা-গড়ার মধ্যে সমাজের নিশ্চলতা ও স্থিরতা বিসদৃশ লাগে।' ছোট ছোট গণতন্ত্রের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণতাই ছিল গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বর্ণকেন্দ্রিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক গ্রামও গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় নগরগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, সেগুলি সাধারণত তীর্থস্থান ও রাজবসতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে; বাণিজ্যের বন্দরকে কেন্দ্র করে গঠিত শহরের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' সুরক্ষিত নগর ও নগরপরিকল্পনার যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় সারা ভারতে নাগরিক সমাজ-জীবন কেমন উন্নত ছিল। এই সূত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে গ্রাম্য সমাজ ও নাগরিক সমাজের

মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। নাগরিক জীবন গ্রামগুলিকে গ্রাস করতে পারেনি গ্রাম্য জীবনের আত্মকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য। মধ্য যুগে এ ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও বিপ্লব এসেছে আধুনিক যুগে যখন নাগরিক জীবন গ্রাম্য সমাজকে প্রায় ভেঙ্গে দিয়েছে। এই সমাজবিপ্লব ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলায় অনেক বেশী স্পষ্ট।

আর্য সমাজপদ্ধতি প্রবর্তিত হবার পর বাংলায় জাতিভেদও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রচুর রক্তমিশ্রণের ফলে ও অনার্যদের সংখ্যাধিক্যের জন্য জাতিভেদের কঠোরতা আর্যাবর্তের মতো এখানে ছিল না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পর্যায়ে যাদের উন্নতি হল এ দেশে সংখ্যায় তারা বেশী ছিল না; তথাকথিত শূদ্রেরাই এখানে সামাজিক জীবনে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মূল চারটি জাতি ছাড়াও সংকর জাতির প্রাচুর্য প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' থেকে হিন্দুযুগের শেষ দিকের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা বাংলা দেশ সম্বন্ধেই বিশেষ প্রযোজ্য। এই সূত্রে ব্রাহ্মণের মৎস্যাহার, ৩৬টি শূদ্রজাতির উৎপত্তি ইত্যাদির উল্লেখ লক্ষ্য করা উচিত। শোনা যায় রাজা বেন বর্ণাশ্রম ধর্ম নষ্ট করবার জন্য জোর করে মিশ্রজাতির সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও এই রকম সংকর জাতির উল্লেখ রয়েছে। বল্লাল-চরিতের আখ্যানগুলি থেকে মনে হয় যে এক বর্ণ থেকে আর এক বর্ণে উত্থান বা পতন সমাজে প্রচলিত ছিল এবং অন্নগ্রহণ ও বিবাহ সম্বন্ধেও বিধিনিষেধের অতিরিক্ত কঠোরতা ছিল না। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য থাকলেও অন্য জাতি উপেক্ষিত হয়নি। নীচ জাতি থেকেও কেউ কেউ রাজপদ পেয়েছে। জাতির প্রখর বৈষম্য হিন্দুযুগের অবনতির সময়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অবাঙালী সেন রাজারাই জাতিপ্রথা ও সামাজিক বিধিনিষেধ কঠোর করে তোলেন। সারা বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে আজো উচ্চবর্ণেরা সংখ্যায় অল্প।

দুই

সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা শ্রমশীলতা, সাহস, সৎস্বভাব ও সদ্ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যোৎসাহ ও বিদ্যাচর্চা তিনি সারা বাংলাতেই লক্ষ্য করেছিলেন। বাংলার মেয়েদেরও যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল প্রাচীন কালে। বাৎস্যায়ন ও ধোয়ীর রচনা থেকে মনে হয় অবরোধ-প্রথা মোটেই কঠোর ছিল না; একেবারে স্বাধীন গতিবিধি না থাকলেও মুক্তির যথেষ্ট অবকাশ ছিল। পুরুষের বহুবিবাহ ও স্ত্রীলোকের সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তির কথা শোনা যায়, কিন্তু সাধারণত নৈতিক আদর্শ উচ্চই ছিল। দুর্গাপূজা এখনকার মতোই প্রধান পর্ব ছিল। কিন্তু বিজয়া দশমীর শাবরোৎসব ও কামমহোৎসব প্রভৃতি কয়েকটি পর্বে অশ্লীলতার চূড়ান্ত হত। জীমূতবাহনের 'কালবিবেক' ও বৃহদ্ধর্মপুরাণের আনুষ্ঠানিক বিবরণ থেকে মনে হয় তান্ত্রিক প্রভাবে হিন্দুযুগের শেষ দিকে সমাজে নৈতিক অবনতির আরম্ভ হয়েছিল। প্রাচীন যুগেও এখনকার মতো ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জন্মাষ্টমী, দশহরাস্নান, আকাশপ্রদীপপ্রথা ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। দেবদাসীপ্রথা ও 'দেয়াসিনী' নাচের কথা 'পবনদূত'-লেখক ধোয়ী উল্লেখ করেছেন। মনসাদেবীর আবির্ভাব কবে বাংলা দেশে হয়েছে জানা যায় না, কিন্তু তাঁর কল্যাণে অনেক অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সাপ-খেলানো তখনও জনপ্রিয় ছিল এবং বেদেরা সাপ খেলিয়ে ভিক্ষা করত।

নিম্নশ্রেণীর বৈবাহিক সম্পর্ক সাধারণত স্থানীয় সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। কিন্তু রাজবংশ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রথা প্রচলিত ছিল। নগরবাসিনীদের পরনে সূক্ষ্ম বসন, বাহুতে সোনার তাগা, মাথায়

তৈলসিক্ত চূড়াকবরী আর ফুলের মালা থাকত। নাগরিক চালচলন সরল গ্রাম্য লোকদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। গোবর্ধনাচার্যের একটি শ্লোকে একটি মেয়ে আর একটিকে বলছে :

সখি, সোজা পা ফেলে চল আর নাগরিক আচার ছাড়। এখানে আড় চোখে তাকালেও গাঁয়ের মোড়ল ডাইনী বলে শাস্তি দেয়।

এর সঙ্গে শরণের একটি শ্লোকের তুলনা চলে বেলাশেষে চাষী মেয়েদের একটি নিপুণ ছবিতে :

ছুটে চলেছে মেয়েরা—তাদের কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়েছে আর তা তুলে দেবার জন্য তাদের যে কি আগ্রহ! সকালে চাষী বেরিয়ে গেছে আর এখন ফেরবার সময় হল ভেবে এরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে আঙুল গুণে হাটে কেনাবেচার হিসাব করে।

প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ চর্যাপদে সেকালের সাধারণ ও দরিদ্র লোকদের জীবনের ভগ্নাংশ চিত্র মেলে। অস্পৃশ্য ডোমেরা সাধারণত শহরের বাইরে বাস করত; তাদের জীবিকা ছিল বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করা আর তাঁত-বোনা। পরনে বস্ত্রের অপ্রাচুর্য থাকলেও এদের মেয়েরা সাজসজ্জা করত বেশ—ময়ূরপুচ্ছের সাজ, গুঞ্জাফলের মালা, ফুলের মালা। শৈব ও বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনায় যোগিনী বা অবধূতীকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করত। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ ও নীচ জাতির লোকই ছিল বেশী। চর্যাপদে এদের সাধনার সাংকেতিক পরিচয়ের সঙ্গে সামাজিক জীবনেরও ছবি পাওয়া যায়। নীচ জাতিদের কয়েকটি বৃত্তি ছিল—মদ-চোয়ানো, নৌকা ও সাঁকো গড়া, নৌকা চালানো, হাতি পোষা, শিকার, জুয়াখেলা, তুলাধোনা, মুখোসপরা নটের নৃত্যগীত। সাধারণত অর্থসাচ্ছল্য থাকলেও প্রাচীন যুগেও দরিদ্র

বাঙালীর 'হাঁড়িত ভাত নাহি।' নিম্ন বঙ্গে নীচ জাতির বসতিই বেশী ছিল এবং সেখানে বিয়ে করা নিন্দনীয় বলে মনে করা হত। এই নিম্ন বঙ্গকেই তখন 'বঙ্গ' বলা হত এবং এখানকার অধিবাসীদের বলা হত 'বাঙালী' :

আজি ভুসুকু বঙালী ভৈলি।
নিজ ঘরিণী চণ্ডালী লেলি॥

(আজ, ভুসুকু, তুই বাঙালী হলি ; চণ্ডালীকে নিজ ঘরণী করলি।)

প্রাচীন সাহিত্যে হাজার বছর আগে শীতারম্ভের দিনে বাংলার ছবি :

চাষীদের ঘরে ধানের স্তূপ ; কচি যবের অঙ্কুরের সঙ্গে নীল পদ্মের যোগে ক্ষেতের সীমা যেন বেড়ে গেছে। গোরু-ষাঁড়-ছাগল ঘরে ফিরে নতুন খড়ে তৃপ্ত ; আখমাড়াই কলের শব্দে গ্রাম মুখর আর নতুন গুড়ের গন্ধে আকুল।

পল্লীবাসী বাঙালী গৃহস্থেরও ছবি পাওয়া যায়—শুভাংকের বর্ণনায় :

গৃহকর্তা নির্লোভ, ধেনুতে গৃহ পবিত্র, উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাষ, গৃহিণী অতিথিসৎকারে অক্লান্ত।

কিন্তু দারিদ্র্য ছিল না ? ছিল আর তারও নিখুঁত ছবি মেলে সংস্কৃত শ্লোকে :

দেহ শীর্ণ, বস্ত্র জীর্ণ ; ক্ষুধায় আকুল শিশুরা আহার চায় আর দীন গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। জীর্ণ গাড়ুতে এক ফোঁটা জল ধরে কিনা সন্দেহ। গৃহিণী কাতর হাসি হেসে ছেঁড়া কাপড়টুকু সেলাই করবার জন্য বিরক্ত প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সূচ চাইছেন।

কোনো সময়েই এমন সমাজব্যবস্থা ছিল না যার ফলে দারিদ্র্য ও অবিচারের লোপ ঘটে। পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যে বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় তার মতো যথেষ্ট ঐতিহাসিক শক্তিও সঞ্চিত হয়নি।

তিন

প্রাচীন বাঙালী সমাজের মূল ধারা মধ্য যুগে প্রায় অব্যাহত থাকলেও বাহ্য পরিবর্তন হয়েছিল প্রচুর। গ্রাম্য সমাজ মোটামুটি পুরানো পদ্ধতিকেই অনুসরণ করে চলেছিল। প্রাচীন যুগের মতো মধ্য যুগেও সামন্ত রাজাদের স্থানীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিদেশীর অভিযানে রাজধানীতে বিপর্যয় উপস্থিত হত, গ্রাম্য জনসাধারণও অল্প-বিস্তর বিব্রত হত। কিন্তু শহর থেকে অনেক দূরে ছড়ানো গ্রাম-গুলোয় এই বিপর্যয়ের ঢেউ সমাজভিত্তিকে টলাতে পারেনি। তা ছাড়া মুসলমানেরা কোনো স্পষ্ট ও পৃথক সামাজিক ধারণা নিয়ে আসেনি; তারা এসেছিল বিজয়-অভিযানে এবং তারপর এখানে বসতির সময়ে প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। মধ্য প্রাচ্য থেকে ভাগ্যান্বেষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির আগমন হলেও মূল সমাজব্যবস্থায় বিশেষ আপত্তি হয়নি—পাঠান যুগে তো নয়ই।

নতুন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল বটে আর তার ফলে বাহ্য জীবনে অবশ্যই পরিবর্তন, বৈচিত্র্য ও সমন্বয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগেও এ রকম ব্যাপার বহু হয়েছিল; অবশ্য সেই বিলুপ্ত ইতিহাসের সামান্যই আমরা জানি। নতুন নতুন শহরের আবির্ভাব, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিদেশীদের আগমন, দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ও নানা রকম আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সময়ের স্রোতে জীবনযাত্রার উন্নতি বা অবনতি —এ সবেরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে প্রাচীন কাল থেকে খানিকটা পার্থক্য তো দেখা দেবেই। কিন্তু নতুন কোনো ভাবসংঘাতে ভিত্তিনাশী সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়নি। তা যে হয়নি আজো তার প্রমাণ রয়েছে পল্লীসমাজের এমন অনেক লক্ষণে যেগুলোর বয়স প্রায় হাজার বছর।

১৪০০ থেকে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সামন্ত প্রথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তারপর অর্থাৎ মোগলযুগে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ, তোডর মল্লের নতুন সামন্তসৃষ্টি, বাণিজ্যের প্রসারে বণিকশ্রেণীর প্রভাব, মগ-ফিরিংগি-বর্গির হাঙ্গামায় দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষতি, য়ুরোপীয় বণিকদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবিস্তার —এগুলোর ফলে কিছু কিছু পরিবর্তন হলেও সমাজের কাঠামো বদলায়নি। নতুন কারুকার কিছু গজিয়ে উঠেছিল জীবনযাত্রার নতুন তাগিদে। কিন্তু বিজ্ঞান ও গুরুশিল্পের যুক্তবিপ্লব এই যুগে ঘটেনি; নগরীর অভাব না থাকলেও মহানগরী ছিল না।

চার

১৩২৫-১৩৫৪।

আমি, মহম্মদ ইবন বাটুটা, জন্মেছি তাঞ্জিয়ারে। উনত্রিশ বছর কেটেছে শুধু ঘুরে ঘুরে। মক্কা থেকে ভারতে যাবার ইচ্ছা হল। কিন্তু জেদ্দায় জাহাজ পেলাম না। এশিয়া মাইনরের সারি সারি শহরের মধ্য দিয়ে, কৃষ্ণ সাগরে পাড়ি জমিয়ে কনস্তান্তিনোপল ও খোরাসান পার হয়ে এলাম ভারতবর্ষে।

কালিকাট থেকে তেতাল্লিশ দিন জলপথে কাটিয়ে নামলাম বাংলা দেশে। বিরাট দেশ—ধানে ভরা। পৃথিবীতে কোথাও এতো সস্তায় জিনিস পাওয়া যায় না। এক দারহাম দামে আটটি মোটা মোরগ, দানাপুষ্ট একটি ভেড়া দুটি দারহামে। একটি সুন্দরী তরুণী বাঁদী মিলবে একটি স্বর্ণমুদ্রায়। পথে প্রথমেই পড়ল চট্টগ্রাম। এই সমৃদ্ধ শহরের কাছেই রয়েছে বিরাট নৌবহর। এখান থেকেই যুদ্ধ চলে লক্ষ্মণাবতীর সঙ্গে।

চট্টগ্রাম থেকে আমি চললাম কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলে। কামরূপ যাদুবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। আমার উদ্দেশ্য ছিল বিখ্যাত

সাধু শেখ জালালুদ্দিনকে দর্শন করা। ফিরলাম। তারপর মেঘনার দুধারে ফলের বাগান আর গ্রামের সারি দেখতে দেখতে পনেরো দিনে এসে পৌঁছলাম সোনারগাঁও। তারপর যবদ্বীপ।

ভারতে কাটল অনেকদিন। বিয়ে করেছিলাম সাত-আটটি। বাঁদীও ছিল অনেকগুলি। ভারত ছাড়বার সময়ে সকলকেই ছাড়তে হল। সবই আল্লার মর্জি!

পাঁচ

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা মধ্য যুগের সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাঠানবিজয়ের পর মুসলমানেরা

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিরা খায় রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল।

হিন্দুরা তো স্তম্ভিত! বৌদ্ধেরা কেউ পালিয়ে বাঁচে, কেউ বা এই কথা বলে মুসলমান হয়ে যায় যে, বৌদ্ধদের ওপর হিন্দুদের অত্যাচারের পাপেই 'ধর্ম হৈলা যবনরূপী'।

দেউল দেহারা ভাঙ্গে গো হাড়ের ঘায়।
হাতে পুথি কর‍্যা কত দেয়াসি পালায়।

বিদ্যাপতি লিখেছেন তাঁর 'কীর্তিলতা'য়:

হিন্দু তুরকে মিলল বাস।
একর্ক ধম্মে অওকো উপহাস।
কতহুঁ মিলিমিস, কতহুঁ ছেদ।

হিন্দুর জাতিভেদ আর মুসলমানের ঐক্য হিন্দুরা বিশেষ লক্ষ্য করেছিল। রূপরাম লিখেছেন: 'এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়।' বিদ্যাপতির অভিযোগ এই যে, এরা ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে তার

মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাং, এরা ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে। বিদ্যাপতি আরো বলেন যে, 'বিনু কারণহি কোহাএ বএন তাতল তমুকুত্তা' অর্থাৎ বিনা কারণেই রাগে এদের মুখ হয় তপ্ত তামার মতো লাল। এরা আড় চোখে চায়, দাড়ি আঁচড়ায় আর থুতু ফেলে। বিজয়গুপ্ত ও জয়ানন্দ বলেন যে, ব্রাহ্মণ দেখলেই তার পৈতা ছিঁড়ে মুখে থুতু ফেলা এদের যেন একটা বদ অভ্যাস। মুকুন্দরামের দুঃখ এই যে, এরা 'ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত'। কিন্তু তাহলেও তিনি কালকেতুর' মুসলমান প্রজাদের সুখ্যাতি করেছেন :

ফজর সময়ে উঠি　　বিছায় লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ। ··
বড়ই দানিশমন্দ　　কারে নাহি করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ　　মাথায় না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।

এদের মধ্যে 'কেহ নিকা কেহ করে বিয়া' ; মোল্লারা 'দোয়া করে কলমা পড়িয়া'। এরা হল তাঁতী, কামার, জেলে ইত্যাদি ; আবার 'কাণ হয়ে মাংগে কেহ পায়া নিশাকাল' ; কেউ বা 'নিরন্তর মিথ্যা কহে, নাহি রাখে দাড়ি'।

মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে হিন্দুদের কারো কারো মুসলমানী আচার দেখে গোঁড়া হিন্দুরা দুঃখ করত :

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে
মসনবি আবৃত্তি করিবে কোন জন।...

মুসলমানদের মধ্যেও এরকম ভাব ছিল। যবন হরিদাসের হিন্দু আচার লক্ষ্য করে মুসলমান শাসনকর্তা তাঁর ওপর ভীষণ অত্যাচার

করে কারণ 'মহাবংশজাত' অর্থাৎ মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর আচরণ অসহ্য :

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার।···
আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত
তাহা বুঝি ছাড় হই মহাবংশজাত।

মুসলমান যুগের প্রথমে ও পরে মাঝে মাঝে দুর্বৃত্তদের দ্বারা যথেষ্ট অত্যাচার হলেও হিন্দুর ধর্মকর্মে মুসলমান শাসকেরা মোটামুটি হস্তক্ষেপ করেননি। অনেক সময়ে হিন্দুর দিক থেকে মেলামেশা ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কে আপত্তি থাকায় মুসলমানেরা অপমানিত বোধ করে উত্তেজিত হয়ে অনেক অত্যাচার করেছে। তাছাড়া ধর্মবিরোধ হিন্দু-বৌদ্ধের মধ্যেও প্রাচীন যুগে ছিল আর মধ্য যুগে তো ধর্মবিরোধ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। মুসলমানেরা সব সময়ে তুর্কী, পাঠান বা মোগল ছিল না; তাদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হিন্দু ও তাদের বংশধরেরাও ছিল। ধর্মান্তরগ্রহণও অনেক সময়েই হিন্দুদের সামাজিক অনুদারতার ফলে হয়েছিল। এইসব ব্যাপার সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সম্পর্কে যথেষ্ট প্রীতি ছিল। শ্রীচৈতন্য একবার ক্রুদ্ধ হলে কাজি তাঁকে শান্ত করবার জন্য বলেছিলেন :

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা,
দেহ সম্বন্ধে হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা,
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

আবার শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ পেল শ্রীবাসের মুসলমান দরজি

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন,
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন।

সারা মধ্য যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ দেশে বসতি করবার পর মুসলমানেরা বহু হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করেছে; আবার অনেক মুসলমান মেয়েও হিন্দুকে বিবাহ করেছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের উদারতার অভাবে ইচ্ছা থাকলেও মুসলমানের পক্ষে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে হিন্দুই মুসলমান হয়েছে আর অনেক বৌদ্ধও মুসলমান হয়েছে। পিতৃকুল, মাতৃকুল বা উভয় কুল থেকেই হিন্দুরক্ত বাংলার মুসলমানের দেহে বিদ্যমান। উচ্চ বর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণ বংশের বহু হিন্দু পুরুষ ও নারী মুসলমান অভিজাত বংশের সৃষ্টি করেছে। এই রক্তমিশ্রণ ও নিম্নজাতির দলগত-ভাবে ধর্মান্তরগ্রহণের ফলে বাংলার মুসলমান বাংলার হিন্দু থেকে একটা পৃথক জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। অভারতীয় ও অবাঙালী মুসলমানের বংশধারা বাংলায় নগণ্য। তাই ম্যাক্‌ফার্লেন্ রক্ত পরীক্ষা করে বলেছেন যে, বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি নয়, রক্তের কোনো প্রভেদই নেই।

১৮৭২ সালের লোকসংখ্যাগণনার বিবরণীতে লেখা হয়েছে :

> মুসলমানেরা যখন বাংলা আক্রমণ করে তখন এখানকার হিন্দুধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল।…নিম্নবর্ণের লোকদের গোলামে পরিণত করা হয়েছিল।…ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ অত্যাচারের প্রয়োজন হয়নি। বিহারে ইসলামের প্রসার বন্ধ হয় হিন্দুত্বের প্রতিরোধে, কিন্তু বাংলার সে শক্তি ছিল না।… নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের চেহারার সাদৃশ্য বোঝা যায়।

অভিযান ও অরাজকতার সমাপ্তির পর যখনই মুসলমানী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনই সমাজে হিন্দুর স্থান অক্ষুন্ন থেকেছে। সংখ্যাতেও হিন্দুরা বেশী ছিল। শাসনভার, সামরিক দায়িত্ব, সংস্কৃতিচর্চা—কোনো বিষয়েই হিন্দুর উন্নতি ব্যাহত হয়নি, বরং

মুসলমান শাসনকর্তাদের প্রচুর পোষকতা ছিল। ইংরেজী শাসন আরম্ভ না হলে এতদিনে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক পার্থক্য অনেকটা দূর হয়ে জাতীয়তা গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে গড়ে উঠত। নানা কারণে সেই ব্যাপারটি যে ঘটে উঠছিল তা মধ্য যুগের সামাজিক ইতিহাস ব্যাপকভাবে আলোচনা করলেই বোঝা যায়। লোকসংস্কৃতি, আচারবিচার, দেশজ প্রথা ও ভাষা ইত্যাদিতে এই সামাজিক ও জাতীয় সমন্বয়ের লক্ষণ স্পষ্ট। তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি বলেছেন :

জাজপুরের দেহারা বন্দিব এক মন
যেইখানে অবতার হইল যবন।

তাই 'চৌধুরীর লড়াই'-গীতিকায় মুসলমান গায়ন বলেছেন: 'বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ।' পীর ও পীরস্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশ্বাস হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমভাবেই প্রবল ছিল এবং এখনো আছে বিশেষত পল্লীগ্রামে অনেক হিন্দুর মধ্যে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সীতারাম দাস লিখেছেন :

বন্দো পীর ইসমালি গড় মান্দারণে।
দারা বেগ ফকির বন্দিব নিগাঞে
জোড়হাতে বন্দিব পাঁড়ুয়ার সুফী খাঞে॥

সত্যনারায়ণ ও মাণিকপীর ইত্যাদি তো দুই সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পত্তি। হিন্দুরা যেমন মহরম পর্বে অংশ নিয়েছে মুসলমানরাও তেমনি মঙ্গলচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, শীতলা ও মনসার কাছে মানত করেছে, শিবের গাজন ও কালীপূজায় যোগ দিয়েছে। পীরের দরগায় শিণি, পীরের কাছে মানত, তাজিয়ায় ফুল দেওয়া হিন্দুদের মধ্যে যেমন প্রচলিত আছে তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও গায়ে-হলুদ, সিঁদুর ও আলতার ব্যবহার, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, নবান্ন, জামাইষষ্ঠী প্রভৃতির অনুষ্ঠান

ও অশৌচপালন প্রভৃতি প্রথা রয়েছে। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনেক পরিবারে এমন সব আচারগত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় যা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, পূর্বপুরুষে নিশ্চয় কোন রক্তমিশ্রণ বা অতিরিক্ত সাম্প্রদায়িক ঘনিষ্ঠতা ছিল। নাম ও পদবীতে তো অনেক সময়েই হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক স্পষ্টই বোঝা যায়।

ছয়

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংকীর্ণতা ও ইসলামের দ্রুত প্রসারের ফলে ব্রাহ্মণ্যবিরোধী কয়েকটি ধর্মমতের উদ্ভব হয়। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মও নানা ভাবে আত্মপ্রকাশের আয়োজন করে। এইসব বিভিন্ন মতের পোষকেরা নিজ নিজ সমাজ ও রীতিনীতি প্রচলন করেন। একদিকে কঠোর, আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর অপর দিকে বিজয়ী ইসলাম—এই দুয়ের মধ্যে যৌথ সামাজিকতার ভিত্তি রচিত হয় এইসব মতের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব, সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্য যুগের সামাজিক জীবনকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

সেনেদের অবাঙালী কৌলীন্যপ্রথা ও জাতিনিপীড়ন বাঙালী জনসাধারণকে বিব্রত করেছিল। এঁদেরই নিমন্ত্রিত কনৌজী ব্রাহ্মণদল বৌদ্ধ ও নিম্নজাতির ওপর বিধিনিষেধ জারি করে। শোনা যায় বাংলায় মাত্র সাত শো ঘর ব্রাহ্মণ ছিল বলেই এঁদের আগমন হয়। পরে দেবীবর ঘটকের শ্রেণীবিভাগ ব্রাহ্মণদের আবার ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আচারবিচারের কঠোরতা, আন্তর্বর্ণবিবাহের লোপ, ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত ও অন্যায় প্রাধান্য, নিম্নশ্রেণীর ওপর সামাজিক গুরুভার ইত্যাদির ফলে হিন্দু সমাজের দুর্বলতা বেড়ে চলেছিল প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত। এই অবাঙালী সমাজপ্রথা বার বার সংশোধন করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রথা বাংলার দ্রুতপরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজন ও দাবি মেটাতে পারেনি।

তাই ধর্মান্তরগ্রহণ খুব বেশী হয়েছে। এই জীর্ণ সমাজের বিরুদ্ধেই শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক বিপ্লব, যাতে খাঁটি বাঙালীত্বের পরিচয় মেলে।

বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে যত রকমের আচার বা প্রথা প্রচলিত আছে তার প্রত্যেকটিই মধ্য যুগে ছিল। মুসলমানী আমলেই অবরোধপ্রথা এ দেশে বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। নারীহরণ ব্যাপারে মুসলমানরা বেশী দায়ী ছিল, কিন্তু পরে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল বিশেষত মগ ও ফিরিংগিদের অত্যাচারে। মোগল শাসনের শেষ দিকে বর্গির হাঙ্গামাও ছিল। ফলে অবরোধপ্রথা ও নারীহরণের ধারা মধ্য যুগ থেকেই বেশ স্পষ্ট হয়েছে।

সাত

এ যুগের শেষ দিকে বাঙালী সমাজে আবির্ভাব হল বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়ের। কিন্তু সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব দেখা যায় মগ আর ফিরিংগিদের ; অবশ্য এ প্রভাব মূলত অত্যাচার ও রক্তমিশ্রণের ইতিহাস। জলপথে পোর্তুগীজ ফিরিংগি আর মগদের দস্যুবৃত্তির উৎপাতে সমুদ্রতীর ও অনেক নদীর দুই পাশের বাঙালী অধিবাসীরা অমানুষিকভাবে নিপীড়িত হয়। সামন্ত রাজারা ও দিল্লির সম্রাট এদের সহজে দমন করতে পারেননি। এরা ছোট ছোট নৌকায় অতর্কিতভাবে বাণিজ্য-জাহাজ ঘিরে ফেলে লুণ্ঠন চালাত কিংবা হঠাৎ হাট-বাজার, উৎসবসভা বা বিবাহভোজে উপস্থিত হয়ে অত্যাচার করত। সামসুদ্দিন তালিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এরা হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করে হাতের পাতায় ছিদ্র করে সরু বেত ঢুকিয়ে বেঁধে জাহাজের পাটাতনের তলায় ফেলে রাখত। নিজেদের রাজ্যে এই বন্দীদের এরা নানা কাজে লাগাত ; অনেক সময়ে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ও মধ্য

প্রাচ্যে বন্দীরা বিক্রীত হত। বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান এদের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়েছেন এবং বহু সৈয়দ মহিলা এদের দাসী বা উপপত্নী হয়েছেন। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ক্রনিক্‌ল্'-পুস্তিকায় লেখা আছে যে, আরাকানের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ লোক বন্দী বাঙালী বা তাদের বংশধর। এই মগ-ফিরিংগিরা তৎকালীন বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কী যে দুর্যোগ এনেছিল তার আভাস পাওয়া যায় 'নসির মালুম' ইত্যাদি পল্লীগীতিকায়। এদের গায়ে থাকত লাল কোর্তা, মাথায় নানা রঙের পাগড়ি আর হাতে দূরবীন। বাঙালী বণিকের বাণিজ্যযাত্রা-প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম বলেছেন যে, গঙ্গার মোহনায় ফিরিংগি জলদস্যুদের আড্ডা ছিল ভয়ের স্থান :

ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে ;
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে।

নরসিংহ বসু লিখেছেন :

তমোলুক দক্ষিণে সম্মুখে সোনজড়া,
রাতারাতি পার হৈল ফিরিঙ্গির পাড়া।

মগদের সংস্পর্শে এসে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার এখনো পতিত আছে, যেমন বিক্রমপুরের 'মগ' ব্রাহ্মণেরা। মগ ও ফিরিংগিদের আগমনে বাংলায় মিশ্র জাতিরও উৎপত্তি হয়েছিল। চট্টগ্রাম, খুলনা, ২৪ পরগনার উপকূল, নোয়াখালি, সন্দীপ, ঢাকা ও সুন্দরবন অঞ্চলে মগ-ফিরিংগিদের অনেক বংশধর এখনো বাস করে। নির্বিচার ও অবাধ ব্যাভিচারের ফলে ফিরিংগিরা কয়েকটি ব্যাধিও এ দেশকে দান করেছিল। বাংলায় খৃষ্টধর্মও এরাই আনে।

দিল্লির সম্রাটের চেষ্টায় ফিরিংগিদের অত্যাচার অবশেষে দূর হয় বটে, কিন্তু অপহরণ ও ক্রীতদাসপ্রথা একেবারে দূর হয়নি।

তার প্রমাণ জামোর্। সে ছিল একটি পাগড়িবাঁধা কালো মূর্তি—ফরাসী রাজসভায় মাদাম্ দ্যু বারির পোষা ভাঁড়। ফিরিংগি ডাকাত তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বাংলার কোন অনামা নদীর পারের গ্রাম থেকে। মাথায় পাগড়ি বেঁধে ভাঁড়ামি করে সে রাজারাণীর মন যোগাত। কিন্তু মনে ছিল তার প্রতিহিংসার আগুন। ফরাসী বিপ্লবের নরমেধযজ্ঞে ফরাসীর সঙ্গেই আহুতি দিয়ে নেচেছিল এই বাঙালী ক্রীতদাস জামোর্।

আট

মধ্যযুগের বাংলার জীবনযাত্রাকে ইতিহাসের পাতায় পুনর্গঠন করা এক দুরূহ ব্যাপার। ঐতিহাসিক উপাদান খুবই অল্প। কখন যে কাহিনী বা কিংবদন্তী এসে অলক্ষ্যে ইতিহাসের স্থান অধিকার করে বসে তা বোঝা শক্ত। গোলাম হোসেন সেলিমের লেখা পারসিক গ্রন্থ, 'রিয়াজ্-উস্-সালাতিন্', ব্লক্মান্ সাহেবের মতে একটি প্রামাণ্য রচনা যার ঐতিহাসিক মূল্য নাকি অসামান্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত নেমে এসেছে মুসলমানী আমলের বিবরণ এই বইটিতে। অবশ্য গোলাম হোসেন মোহমুক্ত ঐতিহাসিক নন। ব্যক্তিত্বের উত্তাপে তাঁর রচনা উত্তেজিত। সেই উত্তেজনা বাদ দিয়ে মধ্যযুগের বাংলার কিছু খবর সরবরাহ করা গেল।

পূর্ব থেকে পশ্চিম অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগাড়ি ৪০০ 'কারো' বা 'কোশ'। উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য হল ২০০ 'কারো'। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে উড়িষ্যার খানিকটা। সুবা বাংলার বিভাগ ছিল ২৮ সরকার ও ৮৭ মহল। গোলাম হোসেনের মতে কুচবিহার বড়ো চমৎকার জায়গা। এর অন্তর্গত ছিল কামরূপ। হোসেন সাহেব কামরূপ অধিবাসীদের সৌন্দর্যের সুখ্যাতি করেছেন এবং তাদের যাদুবিদ্যার ক্ষমতায় হয়েছেন বিস্মিত। এখানে নাকি এমন

ফল পাওয়া যায় যার গন্ধ কয়েক মাসেও নষ্ট হয় না। আসামের ধারে মারি ও মাস্‌মি নামে দুটি উপজাতি আছে। এদের স্ত্রীলোকেরা সৌন্দর্যে অতুলনীয়া। বন্দুককে এরা ভারি ভয় করে। এরা বলে: 'বন্দুক বড়ো খারাপ জিনিস। একটা গর্জনের পরেই এর পেট থেকে একটা ছোট বাচ্ছা বেরিয়ে এসে মানুষ মারে'! চট্টগ্রামের পাশে আর্‌খাং (আরাকান) নামে এক দেশ আছে। এখানকার লোকেরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। অদ্ভুত এদের সামাজিক পদ্ধতি: মা ছাড়া আর যে কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করা চলে। ভাই বিয়ে করে বোনকে। এদের প্রতিবেশী মগদের মধ্যেও এইরকম রীতি আছে। তবে মগেরা নাকি মানুষের আকারে পশু—এরা সর্বভুক্, জল ও স্থলের সব জীবজন্তুই এরা খেয়ে থাকে।

বাংলায় বর্ষা প্রায় ৬ মাস চলে। শেষের দিকটায় নীচু জায়গায় বন্যা হয়ে যায়, আবহাওয়াও হয়ে পড়ে বড়ো অস্বাস্থ্যকর। মানুষ, পশু সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানকার মাটিতে ফসল ফলে খুব। গ্রামবাসীরা শান্ত ও ধীর। অন্যান্য প্রদেশে চাষী ও ও জমিদারের মধ্যে সর্বদাই যে মারপিট লেগে থাকে এখানে সেরকম নয়। আট দফায় এরা সারা বছরের খাজনা জমা দেয় কাছারিতে। কিন্তু কেনা-বেচা ও টাকা-পয়সার লেনদেনের ব্যাপারে বাঙালীদের মতো এমন শঠ ও দুর্বৃত্ত লোক পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ধার নিলে যে টাকা ফেরত দিতে হয় এই ব্যাপার এদের ধারণার বাইরে।

আহারাদির ধারা: মাছ, ভাত, সরিষার তেল, দই, ফল ও মিষ্টান্ন। বাঙালীরা লঙ্কা আর নুন খায় অতিরিক্ত। এদের পোশাক আর রীতিতে রুচির অভাব স্পষ্ট। রুটি এরা কিছুতেই খাবে না। ছাগমাংস বা মোরগের মাংস এদের সহ্য হয় না। স্ত্রীলোক বা পুরুষ এক প্রস্থ কাপড় ব্যবহারে কোনোমতে লজ্জা রক্ষা করে। পায়ে এদের জুতোর বালাই নেই। সর্বাঙ্গে বেশ করে সরিষার তেল মর্দন

করে এরা পুকুরে বা নদীতে স্নান করে। বাঙালী মেয়েরা পর্দা মানে না। দুঃখের কথা এই যে, মেয়েরাও প্রকাশ্যে প্রাতঃকৃত্য সারে!

চারদিকে বনজঙ্গল—গাছের আড়ালে খড়ের কুটির। মাটির বাসনেই কাজ চলে। জলপথেই যাতায়াত বেশী—নানারকমের ছোটবড় নৌকা আছে। ডাঙায় চলে পালকি, জওলা আর সিংহাসন। দেশটা নানারকম ফলে আর শস্যে ভরা। নদী আর পুকুরের সংখ্যা অগণ্য। তবে সেরা নদী গঙ্গা। হিন্দুদের কাছে এর জল অতি পবিত্র। সত্যিই এর জলের তুলনা মেলে না। আর মজার কথা এই যে, এর জল বহুদিন তুলে রাখলেও এতে দুর্গন্ধ হয় না।

এবার গ্রাম ছেড়ে শহর। মখসুস্ খাঁ এক শরাই বসিয়ে জায়গার নাম দিলেন মখ্‌সুসাবাদ। বাড়তে বাড়তে সেই মখ্‌সুসাবাদ মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে হল মুর্শিদাবাদ। বড়ো চমৎকার শহর। এখানে হল রাজধানী, এখানে বসল মুদ্রাশালা। দিল্লিওয়ালাদের সংস্পর্শে এসে এখানকার লোকেরা শিখল আদবকায়দা। নবাব এখানে যে ইমামবাড়া তৈরি করেছিলেন তার তুলনা সারা হিন্দুস্থানে নেই। মতিঝিল আর হীরাঝিলের প্রাসাদও ছিল অপূর্ব।

এককালে সাতগাঁর খ্যাতি ছিল বেশ। পোর্তুগীজ ও অন্যান্য বণিকেরা এখানে তাদের ঘাঁটি পেতেছিল। কিন্তু নদী গেল শুকিয়ে, বন্দরের হল সর্বনাশ। তখন হুগলি বন্দর হল জনপ্রিয়। সারা পৃথিবীর বণিক এসে জমায়েত হত এখানে। কিন্তু পরে ফৌজদারেরা অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কর আর উৎকোচ আদায় করতে লাগল। হুগলি মরল, গজিয়ে উঠল কলকাতার বন্দর!

নবাব জাফর খাঁর আমলে হুগলি বন্দরের কাছে ইংরেজ বণিকরা তাদের ঘাঁটিতে খেতে বসেছে এমন সময়ে নদীতে এল প্রচণ্ড বান। ধ্বসে গেল ইংরেজদের কুঠি, ভেসে গেল ইংরেজদের সম্পত্তি। জব্ চার্নক্ তখন লাখোঘাটের কাছে খুব উঁচু এক কুঠি গড়তে শুরু করলেন। কিন্তু কাছাকাছি জায়গার অভিজাত মুসলমানেরা হুগলির

ফৌজদারের কাছে আপত্তি জানালেন : এতো উঁচু কুঠির ওপর থেকে ইংরেজরা তাঁদের হারেমের ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাবে; তাঁদের মেয়েদের আব্রু বজায় থাকবে না। এই ব্যাপার নিয়ে ভীষণ সোরগোল পড়ে গেল। দিল্লিতে মুসলমানী মেয়েদের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য আবেদনের পর আবেদন ছুটোছুটি করতে লাগল। অবশেষে জব চার্নক্ হুগলির কুঠি অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে তাঁর দলবল নিয়ে এসে নীড় গড়লেন কলকাতায়। গজিয়ে উঠল হুতোম প্যাঁচার 'আজব শহর কলকেতা'। কলকাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গোলাম হোসেন সেলিম 'রিয়াজুস সালাতিন্' গ্রন্থে ইতিহাসের সঙ্গে কবিতাও লিখে রেখেছেন।

নতুন ইংরেজ শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে হোসেন সাহেবের কোনো বিদ্বেষ ছিল না—যেমন ছিল 'সির্-উল্-মুতাখরিন্' গ্রন্থের লেখকের। নবাবী আমলের শেষ দিকে যে দুর্নীতি ও অবসাদে সারা বাংলা দেশটা ভরে উঠেছিল হোসেন সাহেব বুঝেছিলেন যে তার অবসানের একান্ত প্রয়োজন। নতুন ঐতিহাসিক শক্তির আবির্ভাবের আবশ্যকতা বুঝেই তিনি ইংরেজদের প্রশংসা করেছিলেন। খাঁটি দার্শনিকের মতো তিনি বলেছেন : 'ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে বিবাদ সেই একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে। সাম্রাজ্যের স্বপ্নও এক, তফাত শুধু প্রকাশভঙ্গীতে।'

নয়

বছরের হিসাবে ব্যবধান বেশী নয়, কিন্তু তবু মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগ অনেক দূরের পথ।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল সামাজিক অখণ্ডতা—শ্রেণীবিভাগ সত্ত্বেও। কিন্তু আধুনিক যুগে হয়েছে একটি স্পষ্ট পৃথক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব আর ইংরেজী আমল হচ্ছে মূলত এই মধ্যবিত্তেরই ইতিহাস। ১৮৮৯ সালের লোকসংখ্যা-

বিবরণী থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী (যেমন কেরানী, উকিল-মোক্তার, খুচরা দোকানদার ও ব্যবসায়ী, শিক্ষক-অধ্যাপক ইত্যাদি) বেশ গড়ে উঠেছে, কিন্তু বিজ্ঞানসংক্রান্ত মধ্যবিত্ত (যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি) এল আরো পরে যন্ত্র ও বিজ্ঞানের ক্রমপ্রসারের সঙ্গে। এই যন্ত্রবিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের যুক্ত প্রভাবেই অতীত সমাজের মূল ধারা থেকে বর্তমান বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজকার দিনের সামাজিক রূপান্তরের প্রায় প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের উৎস বা মূল কারণ এখানেই অনুসন্ধান করতে হবে। পরিবেশের পরিবর্তন ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া জনসাধারণের ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছে, বিশেষত ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফলে। সোজা কথায়, সমাজে বিপ্লবী রূপান্তরের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এর কারণ কী? কার্ল্ মার্ক্স্ বলেছেন :

> যে জাতিরা আগে ভারতবর্ষে এসেছিল তাদের মধ্যে শুধু ব্রিটিশেরই সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নততর। ব্রিটিশ ভেঙেছে ভারতীয় গ্রাম্য সমাজের ভিত্তি আর শিল্প-বাণিজ্যের উচ্ছেদ করেছে।...ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে রয়েছে এই ধ্বংসের কলঙ্ক।...তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের নব জাগরণ শুরু হয়েছে।

বাংলায় এসে প্রতিষ্ঠার পরে এখানকার অর্থনৈতিক রীতি ও সমাজপদ্ধতি ইংরেজ পছন্দ করেনি। অনেক ইংরেজ অবশ্য প্রশংসার বস্তুও দেখেছিল। কিন্তু শাসনভার যাদের ওপর ছিল তারা ছিল শোষক। তাই দুর্নীতি আর লুণ্ঠনের ফলে এখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বদলাতে লাগল। ইংরেজের সুবিধার জন্য সাহায্যকারী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্ট হল যার ফলে সমাজবিন্যাস প্রায় একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। বাণিজ্য ও লুণ্ঠনের সঞ্চিত

অর্থ ইংরেজ কাজে লাগাল মূলধন হিসাবে এবং প্রতিষ্ঠিত হল সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র।

বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী প্রাধান্য লাভ করলেও তারা নির্ভর করেছিল ইংরেজের ওপর। এদিকে ইংরেজের সৃষ্ট জমিদারেরা স্থানীয় দায়িত্ব না নিয়ে শুধু খাজনা দিয়ে উদ্বৃত্ত লাগাল নিজেদের ভোগে। ফলে গ্রাম্য সমাজের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। অনিশ্চিত ফসলের ওপর দ্রুতবর্ধমান লোকসংখ্যার চাপ গুরু থেকে গুরুতর হয়েছে। মহানগরীর আকর্ষণ বিভ্রান্ত করল অনেককেই, অথচ শ্রমশিল্পের সময়োপযোগী প্রসার না হওয়ায় বৃত্তির সুযোগ এল না। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত পূর্বভারতে এইভাবে ভূমিবিচ্ছিন্ন লোকসংখ্যা বেড়েই চলল। ভূমির উর্বরতার জন্য বাংলার লোকেরা বিহার ও উড়িষ্যার লোকদের মতো মজুর হবার চেষ্টা করেনি; শ্রমবিমুখতাও কিছু ছিল। ফলে শ্রমশিল্পপ্রসারের সঙ্গে বাংলায় মজুরশ্রেণীতে বিহারী ও ওড়িয়ারাই সংখ্যাপ্রধান হয়ে ওঠে। ইংরেজের কল্যাণে কলকাতা হল ভারতের মহানগরী, শুধু বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে নয়, রাজধানী হিসাবেও বটে—নয়া দিল্লি তো অল্প দিনের ব্যাপার। কাজেই কলকাতায় এল ভারতের সর্ব প্রদেশেরই লোক। বাঙালী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত তখন মনপ্রাণ দিয়ে নতুন সভ্যতাকে পরিপাক করবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। অবাঙালীরা প্রায় বিনা বাধায় প্রতিষ্ঠিত হল অর্থনৈতিক জীবনে। এর ফলে যে সমস্যা পরে দেখা দিল তারই প্রভাবে বাঙালীর সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন চলেছে।

দশ

মধ্য যুগে ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমানের যে যৌথ সমাজ গড়ে উঠেছিল ইংরেজী শাসনে সেখানেও ফাটল দেখা দিল। অবশ্য এই ব্যাপার থেকে বোঝা যায় যে, সাম্প্রদায়িক সমন্বয় সম্পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু আর্য-অনার্য সমন্বয় হতে কতগুলো শতাব্দী লেগেছিল? আজো তো আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়নি। ইংরেজী আমলের অনেক দিন পর্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় কম ছিল—১৮৮১ সালের লোকসংখ্যার গণনাতেই প্রথম তাদের সংখ্যা বাড়ে। আবার শিক্ষাদীক্ষায় সমষ্টিগতভাবে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে সব সময়েই উন্নততর ছিল। কিন্তু বিজিত শাসক-সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা আত্মাভিমানে নতুন কৃষ্টি থেকে দূরে সরে রইল। হিন্দুদের কাছ থেকে ইংরেজ নিশ্চয় বেশী সহযোগিতা পেতে চেয়েছিল ও পেয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন শুরু হল: সম্পত্তি চলে যেতে লাগল হিন্দুর হাতে; ইংরেজী শিক্ষা ও নতুন ভাবধারার জোরে হিন্দুরা এগিয়ে চলল; শাসনব্যাপারেও তারা অংশ নিতে লাগল। ব্যাপকভাবে সামাজিক উন্নতি হল হিন্দুর আর ব্যাপকভাবে অতি দ্রুত অবনতি ঘটল মুসলমানের। মুসলমান হল কৃপার বস্তু আর হিন্দু হল ঈর্ষার পাত্র। এইভাবে বিচ্ছেদ ও সামাজিক বিরোধের ভিত্তিতে পরবর্তী কালের সাম্প্রদায়িকতার সূচনা হল। ইংরেজী আমলের এই আর এক ঘোর সামাজিক বিপ্লব।

কিন্তু এই ব্যাপার থেকে ধারণা করা উচিত হবে না যে, হিন্দু মধ্যবিত্তের ওপর ব্রিটিশ শাসকের সহানুভূতি বা আস্থা ছিল। তা থাকলে সমস্ত শাসনবিভাগের এবং বিশেষত শোষণবিভাগের উচ্চ পদে হিন্দুর সংখ্যা ১৮৮১ সালেও ইংরেজের তুলনায় এত কম থাকত না। ১৮২১ সালেও এক সাহেব লিখেছেন: 'আমাদের ভারতীয় শাসনরীতির মূল সূত্র হবে বিভেদ-ও-শাসন।' একজন বৃটিশ সামরিক কর্তাও এ কথার সমর্থন করেছেন: 'বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ না করে বিরোধ সৃষ্টি করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।'

ইংরেজ-বিদ্বেষ ও সামাজিক গোঁড়ামির মূর্খতার জন্য নতুন ভাবধারা গ্রহণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে বাঙালী মুসলমানের ধীরে

ধীরে চেতনা হচ্ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সংবাদপত্রের মারফত :

> হোসেন সাহেবের প্রস্তাব সহৃদয় দেশবাসী সকলেই সমর্থন করবেন। আমরা আশা করি যে স্যার্ অ্যাশ্‌লি ইডেন্ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য এই প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।
>
> —দি বেংগলি : ২১ অগস্ট, ১৮৮০

> গভর্নমেণ্ট সত্যই যদি মুসলমান সমাজের মঙ্গল কামনা করেন এবং বর্তমানের নিম্নতম স্তর থেকে উদ্ধার করে তাদের উন্নতি করতে চান তাহলে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ যাঁদের আছে তাঁদের এখনই শিক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিত।
>
> —হিন্দু পেট্রিয়ট : ১৬ অগস্ট, ১৮৮০

> মুসলমানদের মধ্যে এক সময়ে যে গোঁড়ামি দেখা গিয়েছিল এখন আর তা নেই। এখন বাংলার মুসলমানেরা উচ্চ শিক্ষার জন্য উৎসাহী এবং সর্বক্ষেত্রে তারা শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণীর সমকক্ষ হতে চায়।
>
> —স্টেটস্‌ম্যান্ : ১৫ অগস্ট, ১৮৮০

মুসলমান শাসকশ্রেণীর অত্যাচার ও হিন্দুর লুপ্ত স্বাধীনতা ও গৌরবের স্মৃতি যে এক দল হিন্দুর মধ্যে মুসলিম-বিদ্বেষ জাগিয়ে রেখেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মুসলমানদের মধ্যেও অনেকের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ঈর্ষা ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মধ্য যুগে অবশ্যম্ভাবী মিলনের পথে দুটি সম্প্রদায়ই এগিয়ে চলছিল। এমন সময়ে এল বিদেশী তৃতীয় পক্ষ যার শাসনের মূল নীতিই হল ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে রাখা। ১৭৬৫ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত দেখা যায় ইংরেজ মুসলিম স্বার্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট বিরোধিতা না করলেও খানিকটা উদাসীনতা দেখিয়েছে। ১৮৬৫ সালেও লং সাহেব বলেছেন যে, সংস্কৃতের মতো আরবী ও ফার্সির চর্চার ব্যবস্থা করা ইংরেজের

উচিত। লর্ড এলেনবরোর 'দৃঢ় বিশ্বাস' ছিল যে, ইংরেজের প্রতি মুসলমানের একটা বিদ্বেষ ও শত্রুভাব আছে।

মূল নীতি বজায় রেখে ইংরেজ ভঙ্গী বদলাল তখন যখন নবলব্ধ চৈতন্যের ফলে হিন্দু মধ্যবিত্ত জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করল। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব করবার মতো শক্তি তখন বাঙালী মুসলমানের ছিল না। তবু সাড়া এসেছিল স্বাধীনতার স্বাভাবিক আকাংক্ষায়। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগেই ইংরেজের চাল প্রকাশ হল। ইংরেজের মুখপত্র স্টেটস্‌ম্যান্ লিখল যে, শিক্ষিত হিন্দুর প্রভাব রোধ করবার জন্য পূর্ববঙ্গে মুসলমানের আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা দরকার। এখন থেকেই ইংরেজের চেষ্টা হল যে সংখ্যাগুরুত্ব ও অনুন্নতির অজুহাতে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে দ্রুতগতিতে ইংরেজানুগত মুসলিম মধ্যবিত্ত ও সাম্প্রদায়িক চেতনার সৃষ্টি করা। পরস্পর ঈর্ষার ফলে বিভেদ হয়ে উঠল বিরোধ, যদিও স্বাধীনতার অভিলাষ স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠতে লাগল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই স্বাতন্ত্র্যের ধারালো সমস্যা ১৯৪৭এর ১৫ই অগস্ট চিরে দিল বাংলাকে আবার দু ভাগে।

সামাজিক দিক দিয়ে এই বিরোধ ও বিভেদ মধ্যবিত্তের জীবনেই আঘাত হানল বেশী ; ফলে দু পক্ষের সামাজিক সম্পর্ক প্রায় অচল হয়ে উঠল। এদের বিষ ছড়িয়ে গেল জনসাধারণের মধ্যে এবং তাদের মধ্যেও জেগে উঠল সাম্প্রদায়িক চেতনা যার চরম রাজনৈতিক পরিণতি ১৯৪৬-৪৭এর দাংগা। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বাঙালী সংস্কৃতির কাঠামো ছিল মূলত 'হিন্দু'। সেটা পরে বিদ্বেষভাবাপন্ন মুসলিম মধ্যবিত্তের কাছে ভালো লাগেনি ; অতএব শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত চেষ্টা করল ইসলামী সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে, অর্থাৎ কাল-ধর্মকে অস্বীকার করে ফেরবার চেষ্টা হল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর আরবে। কিন্তু অন্য দেশের মুসলমানেরা নিজেদের দেশজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার চেষ্টাই করেছে। বাঙালী মুসলমানের পক্ষে তাই

রক্ত, পরিবেশ, ঐতিহ্য, যৌথ সংস্কৃতি ও যুগধর্ম অস্বীকার করে ইসলামী সমাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা আত্মঘাতী হতে বাধ্য।

এগারো

মধ্য যুগে পোর্তুগীজরা বাংলায় খৃষ্টধর্মের আবহাওয়া আনল। ইংরেজী আমলে কৃশ্চানদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে। এর কারণ হল নবলব্ধ শিক্ষার ফলে দেশীয় সব কিছুর প্রতি বিরাগের প্রবৃত্তি, হিন্দুধর্মের অনুদারতা, কৃশ্চান্ মিসনারিদের প্রচারকার্য ও সেবা। কিন্তু ধর্মান্তরীকরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মতো ইংরেজ শাসকদের কোন তীব্র উৎসাহ ছিল না। তাছাড়া ব্রাহ্মধর্মের প্রচার, হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা ও সমাজসংস্কারও প্রতিরোধ আনল।

ইংরেজী যুগের প্রথম থেকেই নব্য বাংলার নেতারা সমাজ-সংস্কারের দিকে মন দিলেন। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রভৃতি বীভৎস প্রথার লোপ, বিবাহ সম্বন্ধে নানা রকম সংস্কার (যেমন বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান, বাল্যবিবাহরোধ, অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি) দেখা যায় আধুনিক যুগের বিভিন্ন পর্বে। এই সামাজিক পরিবর্তনের ধারা এখনো চলেছে। জাতিভেদপ্রথায় অনাস্থা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, অবরোধপ্রথার লোপ, কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশে নারীর আবির্ভাব, পুরুষ ও নারীর স্বচ্ছন্দ মেলামেশা—সমস্তই আধুনিক যুগের দ্রুতপরিবর্তমান মধ্যবিত্ত সমাজের লক্ষণ। অর্থনৈতিক কারণে ধনীদরিদ্রের বিরোধও সামাজিক সম্পর্ক এবং রীতিকে একাধিকভাবে পরিবর্তন করছে। এর সঙ্গে নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের সামাজিক পার্থক্যও কমে আসছে।

৩ আজব শহর

এক

আধুনিক যুগে বাঙালীর সমগ্র সামাজিক জীবন কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। আর কোনো সময়ে একটি শহর এমন পরিপূর্ণ ভাবে একটি জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণ করেনি। কিন্তু এই কলকাতা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতা নয়, আবার পরিকল্পনাপ্রসূত একটি সৃষ্টিও নয়। নিরন্তর, নিরবচ্ছেদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির তাগিদে এই কলকাতা বেড়ে উঠে হয়েছে আধুনিক বাঙালী জীবনেয় প্রতীক। তাই একাধিক দিক দিয়ে উনিশ শতকের 'আজব শহর কলকেতা' আধুনিক সমাজের ঐতিহাসিক দিকচিহ্ন। এই দ্রুতপরিবর্তমান সমাজের চিত্র আমরা উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে নিপুণভাবেই পাই।

উনিশ শতকের কলকাতা ও বাংলা কী ভাবে চলেছিল তার হিসাব মেলে তখনকার সংবাদপত্রে :

> ১৯ দিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশ ঘটিকার সময় শহর কলিকাতায় গৌরীবেড়ে বালিকাদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল। তাহাতে অনেক সাহেব লোক ও বিবী লোক ছিলেন। এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্ব্ব সুদ্ধা প্রায় দেড় শত পরীক্ষা দিয়াছে।

> হিন্দু কালেজ। ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক এক জন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই নূতন শিক্ষক

নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে প্রায় ২৫ জন ছাত্র আছে···বালকেরা ইংরাজি ভাষায় যেমন উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে তদ্রূপ ইহার পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। যে সাহেব লোকেরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা কহেন যে আমরা এই বালকদের ইংরাজি শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া চমকৃত হইয়াছি।

হিন্দু কালেজের একজন ছাত্র মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের, নিকট দিয়া গমনকরত ঐ দোকানঘরে প্রবেশপূর্ব্বক এক বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন।

সহমরণ। মোং বাঁশাইনপাড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ ন্যায়-বাচস্পতি কোন্নগর ঘাটে গঙ্গাতীরে পরলোকগত হইয়াছেন এবং তাঁহার পত্নী সহগমন করিয়াছেন।

ইউরোপীয় বস্ত্র। এতদ্দেশে ইউরোপীয় বস্ত্রের আমদানী কিরূপে বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নীচের হিসাব দেখিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন। ১৮১৫—১৪৯০৬৮···১৮২৪—১১৩৮১৬৭।

কলিকাতা বাঙ্ক। ওল্ড কোর্ট ষ্ট্রীটে ৬১ নম্বর ঘরে অর্থাৎ শ্রীযুত পামর কোম্পানি সাহেবের বাটীতে ২ আগষ্ট অবধি কলিকাতা বাঙ্ক নামে এক নূতন বাঙ্ক খুলিয়াছে।

ভার্য্যাবিক্রয়। জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু···কএক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল।

তণ্ডুলসম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল। তণ্ডুল-নিষ্পাদক এক প্রকার যন্ত্র সকলে দর্শন করিলেন। যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুইজন লোকে ১০ দশ মোন তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে।

কলিকাতার নূতন রাস্তা। মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলা হইতে বহুবাজারে গমনাগমনের কারণ নূতন রাস্তা হইতেছে।

…খিদিরপুরের খালের উপর যে সেতু প্রস্তুত হইবেক …লৌহময় এবং শৃঙ্খল দ্বারা উদ্বন্ধিত।

…কুলীনেরদের বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কুব্যবহারেতে কি পর্য্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ··আমরা এস্থলে কএকজন কুলীনের নাম ও তাঁহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন তাহাও লিখিতেছি…

মায়াপাড়া—রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৬২

জয়রামপুর—নিমাই মুখোপাধ্যায়—৬০

আড়ুয়া—রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—৬০

শ্রীযুক্ত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু। কলিকাতা শহরের সীমা সংযুক্ত পূর্বাংশবাসি—মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাতা… ।

শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালির মধ্যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না।

…একাদিক্রমে যবনরাজ্যের চিহ্নসকল এতদ্দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

দুই

কাঁচড়াপাড়ার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় তখনকার দিনের সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক বিবরণ পাওয়া যায়:

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে।

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রতধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।

নীলকরের হদ্দ লীলে, নীলে নীলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্ব্বনাশ।

যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো…
যখন আসবে শমন, কোরবে দমন,
কি বলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি 'হুট' বলে 'বুট' পায়ে দিয়ে,
'চুরুট' ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

তিন

উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজজীবনের নিপুণ চিত্র মেলে দুটি বইতে—'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২)। একটি উপন্যাস, অপরটি সমাজচিত্র; একটির লেখক 'টেকচাঁদ ঠাকুর' বা প্যারিচাঁদ মিত্র, অপরটির লেখক

কালীপ্রসন্ন সিংহ। দুজনই কলকাতার লোক আর তাই বিশেষত কলকাতার জীবনযাত্রা তাঁদের লেখায় নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে।

প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরি করিতেন, কিন্তু কলিকাতার এক জনও ইংরেজী ভাষা জানিত না।···ফ্রেন্‌কো ও আরাতুন পিট্রস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাহেব কিছু কাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।

বৈদ্যবাটির বাবুরাম বাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হরে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই একজন ভট্টাচার্য্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই···এক পাশে কয়েকজন শতরঞ্চ খেলিতেছে।···দুই একজন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে···মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে···।

নৌকা দেখিতে দেখিতে ভাঁটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—বল্‌দেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোবার গাধা থপাস ২ করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হু ২ করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

জাব চারনক একজন সতীকে চিতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন···জাব চারনক বটুকখানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে ২ আরাম করিতেন ও তমাক্ খাইতেন···ঐ গাছের ছায়াতে তাঁহার এমনি মায়া হইল যে সেই

স্থানে কুঠি করিতে স্থির করলেন। সুতানুটি গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আরম্ভ হইল; পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানাজাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল।...

লোকে বলে ইংরাজের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাঁহার (ব্লাকিয়র্ সাহেবের) জন্ম হয়।

নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠিতে যাইয়া বিলাতি পানি ফটাস্ করিয়া ব্রাণ্ডি দিয়া খাইয়া শিশ দিতে দিতে 'তাজা বতাজা' গান করিতে লাগিলেন—কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে ২ খেলা করিতেছে। তিনি মনে জানেন তাঁহাকে কাবু করা বড় কঠিন···।

—আলালের ঘরের দুলাল

চার

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস, তাই গল্পের ধারাই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' আগাগোড়াই সমাজচিত্র :

কলকেতা সহরের চারিদিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়্‌কীর পিঠ সড়্‌সড়্ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে : সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁদা সুতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজোন।"

আজকাল সহরের ইংরাজী কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচু কেতা সহরের গোবরের বষ্ট,' দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ।'

সকালবেলা সহরের বড়মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকিলের বাড়ীর হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মত বসে আচেন।...কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উট্নো-ওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন।...কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন...পেণ্টুলুন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙের চোঙ্গা টুপি। আদালতী সুরে হাতমুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন।

কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক ..সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্মের সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে...।

পূর্বে চুঁচড়োর মতো বারোইয়ারি পুজো আর কোথাও হতোনা, 'আচাভো', 'বোম্বাচাক' প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানাস্থানের বাবুরা বোট, বজরা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখতে যেতেন...।

এখন আর সে কাল নেই...গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তাভস্মের চূন দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না...।

নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছেদ হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে

লাগলো।...পুঁটে তেলি রাজা হলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো।...হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে।...পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।

পূর্বের বড়মানুষরা এখনকার বড়মানুষদের মত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন, এড্রেস্, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না। বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল...তেল মাখতেও ঝাড়া চার ঘণ্টা লাগতো...সেই সময় বিষয়কর্ম দেখা, কাগজপত্রে সইমোহর চলতো...রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো।

সহরের অনেক বড়মানুষ—তাঁরা যে বাঙালীর ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন। বাবু চুণোগলির অ্যানৃড্রু পিক্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড় খুসি হন...।

মিউটিনির হুজুক শেষ হলো—বাঙালিরা ফাঁসি ছেঁড়া আসামীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন...।

কলকেতার ব্রাহ্মণভোজন দেখতে বেশ—হুজুররা আঁতুড়ের ক্ষুদে মেয়েটিকেও বাড়ীতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে ফলারের দিন সেগুলি সব বেরোবে...।

কলকেতায় প্রথম বিধবাবিবাহের দিন...বিস্তর ভট্চাযিরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন, তারপর ক্রমে গাঢাকা হতে

আরম্ভ হন, অনেকে গোবর খান…যতদিন এই মহাপুরুষদের প্রাত্নর্ভাব ততদিন বাঙালীর ভদ্রস্থতা নাই।

—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

পাঁচ

উনিশ শতকের ছবি পাওয়া গেল। কিন্তু কলকাতার অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে আরো অনেক আগে। পনেরো শতকের শেষ দিকে রচিত 'মনসা মঙ্গল' ও ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত 'আইন-ই-আকবরি' প্রমাণ দিচ্ছে। চার্নকের কলকাতার ব্যাপার অবশ্য একটু আলাদা।

সপ্তগ্রাম যখন নির্জীব হল তখন প্রতিপত্তি হল হুগলির। কিন্তু নদীর মুখে পোর্তুগীজ ও আরাকানী জলদস্যুদের উপদ্রবে শাজাহানের আক্রোশ গিয়ে পড়ল হুগলির ওপর। তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল কলকাতা। বৈদেশিক বাণিজ্য আগেই কিছু শুরু হয়েছিল এবং শেঠ বসাকরা এইবার আরো সুবিধা পেল। চার্নকের নজর পড়ল সুতানুটির ওপর; কারণ এই গ্রামটিতে বসে উত্তর ভারতের জলপথের বাণিজ্য সহজেই আয়ত্তে আনা যায়। তা ছাড়া চিৎপুর থেকে কালিঘাট পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের যে পথ ছিল তার সুবিধার কথাও চার্নক ভাবলেন। বৈঠকখানা অঞ্চলে গাছের তলায় বসে ব্যবসাদারদের সঙ্গে গল্পগুজবের সময়ে এবং ধূমপানের অবকাশে চার্নক অনেক কিছুই ভাবলেন ১৬৯০ সালে।

চার্নকের ডায়ারিতে পাওয়া যাচ্ছে :

অগস্ট ২৪, ১৬৯০। কাপ্তেন ব্রুক্‌কে বলেছিলাম তার জাহাজ নিয়ে চলে আসতে সুতানুটিতে। তুপুর বেলায় পৌঁছে দেখি অবস্থা শোচনীয়। মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। সারা দিন ও রাত্রি জুড়ে বৃষ্টির উৎপাতে নৌকাতেই উঠতে হল।

কিন্তু চার্নক নিরাশ হননি। সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা এই তিন গ্রাম দখল করে তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। সুতানুটিতে নদীর কাছে এক মাটির ঘরে মহানগরী কলকাতার জন্ম হল। সহমরণের চিতা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চার্নক বিবাহ করলেন এক বিধবাকে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রত্যেক বছর তাঁর কবরে মোরগ বলি দিতেন চার্নক।

১৬৬৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তিনটি গ্রাম ১৩০০ টাকা দিয়ে কিনলেন আর ১৬৯১ থেকে প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। ১৭৩৭ থেকে ১৭৫৭র মধ্যে এল বিপর্যয়ের পালা : ঝড়, ভূমিকম্প, মারাঠী আক্রমণের আতঙ্ক, সিরাজের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধ। আবার শুরু হল শ্রীবৃদ্ধি এবং কলকাতা হয়ে উঠল ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষে রাজধানী গেল দিল্লিতে।

১৭৮৪র 'ইণ্ডিয়ান্ গেজেট' সংবাদ দিচ্ছে যে কোম্পানির কাউন্সি-লের সভ্যেরা পায়জামা, মসলিনের সার্ট্ আর সাদা টুপি ব্যবহার করতেন। হুঁকায় তামাক খাওয়া সুপ্রচলিত ছিল—এমন কি মেম-সাহেবদের মধ্যেও। ইংরেজের বর্বর বিলাসিতা এতো দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল যে ম্যাক্রাবি লিখেছেন : "চারটি লোকের একটি ছোট পরিবারে দাসদাসীর সংখ্যা ছিল ১১০।"

ছয়

বিশ শতকের কলকাতা ইংরেজের বিষদৃষ্টিতে পড়ল ; মধু ঝরল দিল্লি আর বোম্বের উপর। কিন্তু অনাথ শহর ক্রমে আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। জনস্রোতে আর স্বার্থের তরঙ্গে প্লাবিত হয়ে গেল মহানগরী। একাধারে রাজ্ঞী ও গণিকা এই কলকাতা আজ সারা ভারতের শরণ ও সমস্যা, আশা ও আতঙ্ক। এই দানবীর মোহে

আকৃষ্ট হয়ে রাজা হয়েছে ফকির ; আবার এরই কল্যাণে ভিখারী হয়েছে ধনিক। এর গলিত দেহের অসংখ্য শিরা-উপশিরার মতো পথে আর গলিতে জীবাণুর মতো মানুষের সংঘাতময় জীবনে প্রতি মুহূর্তে রচিত হচ্ছে ভবিষ্যতের অজস্র বীজ। এই মায়াবিনী চোখের ঘুম কেড়ে নেয়, স্বপ্নে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ইংরেজের আশীর্বাদ ও অভিশাপ এই আজব শহর কলকাতা।

এক

'সংস্কৃতি' বস্তুটিকে এক কথায় প্রকাশ করা বা বোঝানো শুধু কঠিন নয়, বোধহয় অসম্ভবও। ব্যাপক অর্থে 'সংস্কৃতি' বলতে একটা জাতির সমগ্র মানস চর্চা ও কর্মসাধনার যুক্ত ফলকে বোঝায়। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, বিদ্যা, শিল্প ও কলা—এ সব ব্যাপারই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা চলে। তাই একটা জাতির সমগ্র সত্তার পরিচয় মেলে তার সংস্কৃতিতে। বাঙালীত্ব তাই বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। এই সংস্কৃতি বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, কোনো বিরোধী সম্পর্কেরও সৃষ্টি করেনি

বাঙালীর মন যে ভাবপ্রবণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালী শুধু ভাবুক নয়, শুধু অনুভূতি তার পাথেয় নয়। জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও গবেষণায়, কর্মে ও সংগঠনেও বাঙালী তার সাধনার পরিচয় যুগে যুগে বার বার দিয়েছে। বিগত হাজার বছরের ইতিহাসে বিপর্যয় ও বিপ্লব, সংকট ও সর্বনাশের প্রহর অনেক বার এসেছে এবং একটা দৃঢ় অলক্ষ্য অধ্যাত্মশক্তির ভিত্তিতেই বাঙালী-চরিত্র আত্মরক্ষা করে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অপরকে সচেতন করে রেখেছে। বাঙালী সংস্কৃতির অখণ্ড রূপের একটি প্রধান কারণ এই যে, জাতিগত ঐক্যের সঙ্গে এখানে মিশেছে ভাষাগত ঐক্য; আর এই ব্যাপারটি ঘটেছে মধ্য যুগে। প্রাক্-ইসলামিক যুগে বাঙালী সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মোটামুটি ভারতীয় কাঠামোই বজায় রেখেছিল। আজ সেই কাঠামো একেবারে বদলে গেছে এমন কথা বলা চলে না, তবে এটা ঠিক যে, মধ্য যুগে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে রূপান্তরের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আর ইংরেজী আমলে সাধনার ধারায় মোড় ফিরে গেছে।

দুই

তেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের যৌথ অবদানে গঠিত ব্যাপক হিন্দুত্ব গজিয়ে উঠেছে ভারতের মাটিতে। কিন্তু ইসলামের জন্ম অন্যত্র এবং সেই জন্যই ইসলামের মনোভঙ্গীও স্বতন্ত্র। তার তেজ, তার গণতান্ত্রিক সাম্যবোধ, তীব্র বিশ্বাস ও নবজাগ্রত বিজয়ী উন্মাদনা প্রাচীন ভারতীয় মনের কাছে একাধিক ভাবে অভিনব ছিল। কিন্তু প্রায় পাঁচ শো বছর ধরে এই শাসক-সম্প্রদায়ের ধর্ম বাংলার মাটিতে মধ্য প্রাচ্যের উগ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। মাটি ও জল, হিন্দু রক্তের প্রাধান্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বহুপ্রাচীন বিধর্মী ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রভাব—এইসব কারণে বাংলার মুসলমান দেশজ ও স্থানীয় সভ্যতার অংশীদার ও উত্তরাধিকারী হয়েছিল। মুসলমানী প্রভাবে বাংলার প্রাচীন কাঠামো কোনো সময়েই সমগ্রভাবে পরিবর্তিত হয়নি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ইসলামী ভাবধারাকে প্রতিরোধ করবার প্রয়াসী হয়েছিল, কিন্তু বাংলা করেছিল পরিপাকের চেষ্টা তার সমীকরণের অপরূপ শক্তিতে।

বাংলায় এই সমন্বয়ের কারণ কী? প্রথমত শরীয়তী মতের পরিবর্তে সুফী মতের প্রভাব। সুফী মতের সঙ্গে বাংলার সাধনার সহযোগিতা সহজেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই সহযোগিতা ও রাজধর্মের আভিজাত্য সত্ত্বেও খাঁটি মুসলমানী উপাদান বাংলার উচ্চতর সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিশিষ্ট মুসলমানেরা আরবী ও ফার্সির চর্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন, বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে ইসলামী কৃষ্টি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেননি; বরং হিন্দু সংস্কৃতিকেই সাহায্য করেছেন। সাধারণ, শিক্ষাদীক্ষাহীন, ধর্মান্তরিত মুসলমান তাই লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যেই ইসলামী ভাবধারার সন্ধান করেছে। এ ব্যাপার অতি সহজেই হয়েছে, কারণ,

ব্রাহ্মণ্যবিরোধী বৌদ্ধ ও অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুই প্রধানত মুসলমান হয়েছে। তাদের রক্তের ঐতিহ্য ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে না পেরে দেশজ সংস্কৃতির মধ্যেই আশ্রয় খুঁজেছে। এইভাবে প্রধানত সমন্বয়ের পথে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি।

ইসলামের মধ্যে সাম্যভাব থাকলেও মুসলমান সমাজে শ্রেণীগত পার্থক্য ও তার সঙ্গে সংস্কৃতির বৈষম্য খুবই দৃষ্টিকটু। বাংলার মুসলমান সমাজে অভিজাত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়ে গেছে স্থায়ী ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভাবে। মধ্য যুগে নবাবী আমলেও তাই গণকৃষ্টির ক্ষেত্রে মুসলমানের অবদান থাকলেও উচ্চতর সংস্কৃতিতে তার দান ও দাবি স্বল্প; আর ইংরেজের যুগে তো লোকসংস্কৃতি নষ্টই হয়েছে; উচ্চতর সংস্কৃতি সৃষ্ট হয়েছে হিন্দুর সাধনায় এবং এই দিক দিয়ে বাঙালী মুসলমান নিঃস্ব হয়ে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলার নবজাত মুসলিম মধ্যবিত্ত বাঙালীত্ব বর্জন করে বৃহত্তর মুসলিম জগতে না হয় অন্তত উর্দু সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করবার চেষ্টা করল। এ শুধু দৈন্যস্বীকার নয়, আরবী ভাষাকে মাতৃভাষা বলে অবলম্বন করার মতোই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রয়াস। এই চেষ্টা পারস্যের মুসলমানেরা করেনি; তুর্কির মুসলমানেরাও ইরানী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি গঠন করে চলেছে। বাংলার মুসলমানের পক্ষে মধ্য প্রাচ্যের এমন কি পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংস্কৃতির অনুকরণ আত্মঘাতী হবে। বাঙালীর আগামী সভ্যতার ভিত্তি হওয়া উচিত হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সাধনা যার ফলে বাঙালীর সমীকরণের ক্ষমতা সারা পৃথিবীর কৃষ্টিকে আত্মসাৎ করে নিতে পারবে। তা না হলে বাংলার বর্তমান সংকট হবে ভবিষ্যতের অপমৃত্যু। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের মতো এই সাংস্কৃতিক বৈষম্যও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ইন্ধন যুগিয়েছে।

বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে মোটামুটি তিনটি যুগ দেখা যায় : (১) প্রাচীন যুগ (খৃষ্টীয় ১২০০ পর্যন্ত)—ভারতীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশ, যার দুটি পর্ব হচ্ছে আর্য-অনার্য-সংস্কৃতি সমন্বয় ও ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-সংস্কৃতি সমন্বয়ের ব্যাপক হিন্দু রূপ ; (২) মধ্য যুগ (খৃষ্টীয় ১২০০ থেকে প্রায় ১৮০০ পর্যন্ত)—হিন্দু-মুসলমান-সংস্কৃতি-সমন্বয়, যার দুটি পর্ব দেখি পাঠান যুগে আর মোগল যুগে ; (৩) আধুনিক যুগ (১৮০০ থেকে শুরু)—প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতি-বিরোধ ও সংস্কৃতি-সমন্বয়, যার তিনটি পর্ব স্পষ্ট বোঝা যায় : ১৮০০-১৮৫৭ ; ১৮৫৭-১৯১৯ ; ১৯১৯-১৯৪৭ ।

বছরের হিসাবে এই যুগ ও পর্ব বিভাগ যে খানিকটা কৃত্রিম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু তাহলেও এতে ক্রমবিকাশ ও ইতিহাসের ধারা বুঝতে অনেকটা সুবিধা হয় ।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের মধ্যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভেদ থাকলেও ব্যাপকভাবে এ দুটির অখণ্ডতাও স্পষ্ট। এখানে শিকড় রয়েছে দেশেরই মাটিতে, সংস্কৃতিও তাই দেশজ । ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায় না ; ইসলামী দানও সমীকৃত হয়ে দেশীয় কৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতি অনেক দিকে ভারতীয়তা ও বাঙালীত্বকে অতিক্রম করেছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে। এর মৌল রূপটি দেশজ নয় ; সমন্বয়ের চেষ্টা থাকলেও বিরোধী ভাবটিও সহজেই নজরে পড়ে । প্রাচীন ও মধ্য যুগের বিভিন্ন পর্বগুলির মধ্যে কোনো দৃঢ় পার্থক্য দেখা যায় না ; অর্থাৎ প্রাচীন যুগের দুটি ও মধ্য যুগের দুটি পর্ব মোটামুটি ক্রমবিকাশেরই পর্যায়। কিন্তু দেড় শো বছরের আধুনিক সংস্কৃতি মূল ভারতীয় ধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়েই গড়ে উঠেছে। এর বিভিন্ন পর্ব বা পর্যায়গুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধও দেখা যায়—যেমন উনিশ শতক ও বিশ

শতকের ভাবধারায়, ইংরেজী অনুকরণে ও ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়তা বাদে। আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদেশিক রাজনীতি ও অর্থনীতিও জড়িয়ে গেছে। কিন্তু তা বলে আধুনিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এই যুগেই বৃহত্তর কৃষ্টি-জগতের সন্ধান মিলেছে ; এই যুগেই হয়েছে ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সূচনা।

এ ছাড়াও আরো কয়েকটা ব্যাপারে তুলনা করলে প্রভেদ সহজেই ধরা পড়ে। পুরানো লোকসংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গ্রাম্য জীবন। আজো তাই গ্রামেই সে ধারার অবশেষ দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে লোকসংস্কৃতির নতুন কোনো ধারাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ; অর্থনৈতিক পথে বিপ্লবী ইঙ্গিতের মধ্যে আগামী কৃষ্টির সূচনা বা সম্ভাবনাই শুধু বোঝা যায়। আগে উচ্চতর সংস্কৃতি নাগরিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল গ্রাম্য জীবনকে অস্বীকার না করেই। কিন্তু এখনকার কৃষ্টি পরিপূর্ণভাবেই নাগরিক এবং গ্রাম্য সভ্যতার সঙ্গে এর যোগসূত্র প্রায় অদৃশ্য।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের সংস্কৃতি ছিল মূলত দেশজ, দেশের মাটিরই ফসল। কারণ, ইসলাম কিছু কিছু নতুন ভাবধারা আনলেও শাসক মুসলমান উন্নততর কোন কৃষ্টি আনেনি, বিজিতেরাও নিজেদের সভ্যতায় আস্থা হারায়নি ; আর তাছাড়া মুসলমানেরা এই দেশেরই অধিবাসী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতির মূলে রয়েছে ভারতীয় সভ্যতায় বেশ খানিকটা অনাস্থা, আর এর কাঠামোয় রয়েছে পাশ্চাত্য সমাজ, বিজ্ঞান ও ভাবধারার স্পষ্ট প্রভাব। ইংরেজ এখানে বণিক-শাসক-সম্প্রদায় হিসাবে স্বতন্ত্র হয়েই থেকেছে, আর নতুন ভাবধারায় আমরাও অনেকটা বিহ্বল হয়ে গেছি। কিন্তু তা বলে এই সংস্কৃতিকে শুধু 'ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি' বা পরাধীন জাতির সংস্কৃতি বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এটা আমাদের কাছে একটি বাস্তব লাভ, একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক

আলোড়ন। তাই সাময়িকভাবে বিচলিত হলেও অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সৃষ্টিক্ষম সমন্বয়ের পথে চলা ক্রমশই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

অতীত সংস্কৃতিতে সমাজের সব শ্রেণীরই দান রয়েছে তার বৈচিত্র্যের মধ্যে। কিন্তু ইংরেজী আমলের যে শিক্ষাদীক্ষা সেটি মূলত মধ্যবিত্ত। অবশ্য মধ্যবিত্তের এই সাধনা যে সমাজের অন্য স্তরে পৌঁছয়নি এমন কথা বলা যায় না, আর তাছাড়া এই সাধনার গৌরবও অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু আবার এই কথাও ঠিক যে, আধুনিক যুগে সারা দেশের ব্যাপক লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশ হয়নি, বরং দৈন্যই দেখা দিয়েছে। আমরা ভুলেছি অনেক কিছু, অবহেলায় নষ্টও করেছি অনেক কিছু। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কালান্তরীয় সংকটও আজ তাই স্পষ্ট। ইংরেজের গড়া মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি তাই ইংরেজের তিরোভাবের আগে থেকেই বিপন্ন।

ইংরেজী আমলের বাঙালী সাধনা হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি লোকসংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত না করে, লোকশিক্ষার প্রচার না করে, নবলব্ধ চেতনাকে দিয়েছিল একটা 'হিন্দু মধ্যবিত্ত' রূপ। এ ধারণা খানিকটা সত্য হলেও সবটা নয়। এই সংস্কৃতিতে এমন অনেক কিছু ছিল যার আবেদন কোনো মতেই সাম্প্রদায়িক নয়, যার মূলে ছিল জাতীয়তা। মুসলমানী আমলেও হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা অল্পই ছিল, আর ইংরেজশাসনের সময়ে নৈরাশ্যাভিমানী বিজিত মুসলমানের নতুন শিক্ষা থেকে দূরে থাকার চেষ্টাও মারাত্মক হয়ে উঠল। ফলে আধুনিক সংস্কৃতি গড়ে উঠল হিন্দুর হাতে, মুসলমানের দান হল অল্প। যৌথ সংস্কৃতি শুধু এক সম্প্রদায়ের চেষ্টায় হয় না। তাছাড়া আধুনিক সংস্কৃতি যে মূলত মুসলিমবিরোধী এমন কথাও বলা চলে না; আর এর 'হিন্দুত্ব' খুব ব্যাপকভাবেই 'হিন্দু' অর্থাৎ ভারতীয় বা দেশজ—অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। হিন্দুর দোষ হয়েছিল মুসলমানকে সঙ্গে টেনে না নেওয়া; আর

মুসলমানের দোষ তার গোঁড়ামি আর শিক্ষা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য। গোপাল হালদারের মতানুসরণে 'হিন্দুর ভুল' বলে সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না। যৌথ কৃষ্টির অভাবে জাতীয়তা সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করতে পারেনি, সংস্কৃতির বৈষম্যও পরে মারাত্মক হয়েছিল। তারই ফসল আজ ভাঙা বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংকট।

চার

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম ফল হল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরাতনের পুনরুজ্জীবন, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে সরিয়ে তার জায়গায় ভারতীয় ও বাঙালী সংস্কৃতির 'স্বদেশী' মূর্তির প্রতিষ্ঠা। অবশ্য আবার এর সঙ্গে সঙ্গেই বৈদেশিক সভ্যতাকে পরিপাক করে জাতীয় কৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করে তোলবার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু ১৯১৪র মহাযুদ্ধের পর থেকে সমস্ত পৃথিবীতে যে নতুন বিপ্লবী ভাবধারার আবির্ভাব হল, যার অর্থনৈতিক চেতনার আঘাতে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা হল অস্থির তারই প্রভাবে বর্তমান সংস্কৃতি চলেছে নতুন পথে। এই অভিনবত্ব শুধু ভাবের আবেগ নয়, এর মূলে রয়েছে অর্থনীতি ও সমাজনীতির পুঞ্জীভূত ও মিলিত ঐতিহাসিক শক্তি। সংকটাপন্ন মধ্যবিত্ত এই ঐতিহাসিক শক্তির তাগিদেই নেমে আসছে গণসমাজের স্তরে। নতুন সভ্যতার এই বিপ্লবী সূচনা নির্দেশ করছে যে আগামী সংস্কৃতি হবে প্রাচীন সাধনা থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। এই দিক দিয়ে ইংরেজী আমলের শোষণের আঘাত যে আমাদের নব চেতনার সম্ভাবনা এনেছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

মার্কস্ বলেছেন যে, বৃটিশ শাসকদের সম্বন্ধে ভারতীয়দের গভীর ঘৃণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আবার ভারতের স্বৈরতন্ত্র গ্রাম্য সমাজপদ্ধতিও ভারতের অগ্রগতিতে বার বার বাধা দিয়েছে কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার সৃষ্টি করে। এই গ্রাম্য সমাজের পরিবর্তনের সূচনা

করেছে ইংরেজী শাসন; তাই শত অপরাধ সত্ত্বেও এ দেশের সমাজবিপ্লবের দায়িত্বের জন্য ইংরেজী আমলের মূল্য রয়েছে, ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজন।

পাঁচ

প্রাচীন বাঙালীর সংস্কৃতি মূলত ভারতীয়, অর্থাৎ বাঙালীর অবদান ও সাধনার মূল্য যথেষ্ট থাকলেও তার কৃষ্টি ভারতীয় ধারাকেই অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল; নিজস্ব মৌলিকতা খুব বেশী ছিল না। তার প্রধান কারণ এই যে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বঙ্গ এক হয়ে একটি ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করতে শেখেনি। এ যুগে উচ্চতর সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি দুইই ছিল, কিন্তু তার ধারাবাহিক ও অখণ্ড ইতিহাস মেলে না।

সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণ্যের প্রাধান্য থাকলেও ধীরে ধীরে বৌদ্ধ-ধর্ম ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যবিরোধী মতবাদ গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার এককালে বাংলায় যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়নি। বৌদ্ধযুগে সামাজিক মনোবৃত্তির পরিবর্তন একটু স্পষ্টভাবেই দেখা যায় এবং তার ফলে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে। এ যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে মোটামুটি অবিরোধী সম্পর্ক থাকার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই অবদানে যৌথ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

সংস্কৃত, পালি ও অন্যান্য প্রচলিত ভাষায় গ্রন্থ রচিত হত। সাহিত্যের নিদর্শন অল্প হলেও জয়দেব ও ধোয়ীর রচনা, চর্যাপদ ও কৃষ্ণবিষয়ী কাব্য উল্লেখযোগ্য; লৌকিক সাহিত্যও নিশ্চয়ই ছিল যদিও তার উদাহরণ পাওয়া কঠিন। আর্য সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই বৈদিক চর্চার আরম্ভও বাংলায় হয়েছিল। পূর্বমীমাংসার চর্চায় পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন শালিকনাথ, ভবদেবভট্ট, হলায়ুধ

প্রভৃতি। সাংখ্যের প্রবর্তক কপিলও নাকি ছিলেন বাঙালী। ন্যায়-বৈশেষিকে বাঙালীর দান উজ্জ্বল।

বৌদ্ধ মহাযান মতের বহু আচার্যই বাঙালী। নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ শীলভদ্র, তিব্বতের ধর্মগুরু দীপংকর ও শান্তরক্ষিত প্রভৃতির নাম আজো খ্যাতি লাভ করছে। হীনযান মতের আচার্য রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে আজো গুরুস্থানীয় ও পূজ্য। লুইপাদ ও তাঁর অনুসরক সিদ্ধাচার্যেরা সহজযানী এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং তিব্বতে এখনও তাঁদের পূজা হয়। ভুটিয়া ভাষায় এঁদের রচনার অনুবাদ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের শৈবসম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ের শ্রীকণ্ঠশিব, শ্রীকণ্ঠশম্ভু ও শিবাচার্য বিশ্বেশ্বর। স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রাচীন যুগেও বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাব ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিজ্ঞানচর্চাতেও বাঙালী পশ্চাৎপদ ছিল না। আয়ুর্বেদের আলোচনা এ দেশে ভালোভাবেই হত এবং হস্তিচিকিৎসায় বাঙালীই ছিল ভারতে অগ্রগণ্য। শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষত বস্ত্রশিল্পে, প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলার প্রসিদ্ধি। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে জানা যায় যে রেশম, বাকল ও কার্পাসের কাপড় এখানে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

নৃত্যগীতচর্চায় প্রাচীন বাঙালীর নাম ছিল, বসনভূষণেও। প্রেক্ষাগৃহ ও অভিনয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় বাঙালী সংস্কৃতি এ দিকেও বেশ অগ্রসর হয়েছিল। ওড্র-মাগধী রীতিই ছিল এখানে বিশেষভাবে প্রচলিত।

ধ্বংসাবশিষ্ট শিল্পকলা থেকে বাংলার গৌরব সহজেই বোঝা যায়। স্থাপত্যশিল্পে পাথরের পরিবর্তে ইটের ব্যবহারই এখানে প্রচলিত ছিল। আর্দ্র আবহাওয়া, নদীবিপ্লব ও বৈদেশিক আক্রমণকারীর অত্যাচার তাই সহজেই এ দেশের স্থাপত্য-নিদর্শন নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু ফা-হিয়েন্ ও হুয়েন্-সাং এর গৌরব তাঁদের বিবরণে লিখে

গেছেন। হিন্দুমন্দির, বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধবিহারই বাঙালী স্থাপত্যের সেরা নিদর্শন এবং পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ থেকে আজো স্থাপত্য-সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। ভারতীয় ভাস্কর্যের মতো বাঙালী ভাস্কর্যও প্রধানত দেবদেবী ও দৈত্যদানবের মূর্তির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু মূর্তিগুলির কমনীয় ভঙ্গী ও শ্রী বাংলার বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। পাথর ও মাটির ফলকে মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার ছন্দ বিচিত্ররূপে ফুটে উঠেছে—কুয়ো থেকে জল তোলা, লাঙল-কাঁধে চাষা, বাজীকরের খেলা, শীর্ণ সন্ন্যাসীর পথ চলা, পূজারী বামুন, শিকারীর দর্প। সহজ, অনায়াস ও অকৃত্রিম এই শিল্পপদ্ধতির মধ্যে প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সামাজিক জীবনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার চিত্রশিল্পের উদাহরণ অল্পই পাওয়া গেছে। কিন্তু এখানেও রেখাবিন্যাস ও বর্ণসমাবেশের মধ্যে বাঙালীর কমনীয়তা ও শ্রীবোধ স্পষ্ট। বাঙালী চিত্রশিল্পের প্রভাব আসাম থেকে আরম্ভ করে দূর প্রাচ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছয়

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মধ্য যুগেই, যদিও প্রাচীন যুগের সঙ্গে এর যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানের ভাবসমন্বয়ে ও রাষ্ট্রীয় কারণে এর জন্ম। এ যুগে বাংলা ভাষাও একটা বিশিষ্ট ও মোটামুটি স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে এবং কৃষ্টিগঠনে এর দানও অসামান্য। পাঠান আমলে ভারতীয় কেন্দ্র থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালীত্ব একটা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছিল, কিন্তু তাহলেও বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টির কোনো বিরোধী সম্পর্ক ছিল না। তার প্রমাণ মধ্য যুগের শ্রীচৈতন্য। মোগল আমলে বাংলা আবার যুক্ত হল কেন্দ্রে, আর এই সময়ে বিদেশী

বণিকদের আবির্ভাবে জীবন ও চিন্তার পরিধিও হল বৃহত্তর। মোগল আমলে বাঙালীর লাভ-লোকসান দুইই হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে হল ক্ষতি, কারণ অর্থ চলল দিল্লিতে; কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বাংলার ভাবের আদানপ্রদানের সম্পর্ক হল ঘনিষ্ঠ।

সংস্কৃতির চর্চা অনেকটাই হত সুলতানী দরবারের পোষকতায়। পৌরাণিক সাহিত্য ও কৃষ্ণলীলাসংক্রান্ত কাব্য ও সংগীত এইভাবেই বিকশিত হয়েছিল। হোসেন শাহ, পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর গুণগ্রাহিতার কাছে বাঙালীর ঋণ থাকবেই। স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন হিন্দুরাজারাও সংস্কৃতির পোষকতায় পশ্চাৎপদ ছিলেন না। কুচবিহার, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি স্থানে এবং বিভিন্ন জমিদারদের আশ্রয়ে কৃষ্টিবৈচিত্র্য গঠিত হয়েছিল। সংস্কৃতির সেবকদের তালিকায় রূপ ও সনাতন এবং গুণরাজ খাঁ (মালাধর বসু) প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; আর সবার ওপরে অবশ্য স্থান পাবে শ্রীচৈতন্যের বিরাট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে রামকেলি, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি জায়গার প্রসিদ্ধি থাকলেও বেশ একটা প্রাণবন্ত কৃষ্টিসাধনার ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলায়, শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে।

ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চায় বাংলার উচ্চতর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রঘুনন্দন, রঘুনাথ প্রভৃতি সুধীর নাম অবিস্মরণীয়; আর নব্য ন্যায়ে বাঙালী তো ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়। নীচ জাতিও শাস্ত্রচর্চা থেকে বঞ্চিত ছিল না। দক্ষিণ রাঢ়ে এখনো ডোম-বাগ্দী পণ্ডিতের টোল আছে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার প্রচলন ছিল। গ্রামে নিরক্ষরতা ছিল, কিন্তু নিরক্ষর চাষীরও সাধারণ জ্ঞান বা শিক্ষার অভাব ছিল না। শুভঙ্করী গণিত উচ্চতর সংস্কৃতির নিদর্শন হলেও সাধারণের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। আয়ুর্বেদীয়

চিকিৎসাবিজ্ঞান বেশ উচ্চ স্তরেরই ছিল ; এ ছাড়া সাধারণ লোকেরা ও গ্রামের মেয়েরা বহু উদ্ভিজ্জ ওষুধের প্রয়োগ জানত। হটন্ ও লং উচ্ছ্বসিতভাবে এ দেশের জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা ও সৌন্দর্য-বোধের প্রশংসা করেছেন।

'সেক শুভোদয়া', 'শূন্যপুরাণ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'কবিকংকণ চণ্ডী' ইত্যাদি এ যুগের সাহিত্যের নিদর্শন। শেষের দিকে এলেন কাশীরাম, কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র। শাবিরিদ খাঁ, দৌলত কাজী, আলাওল প্রভৃতি মুসলমান কবিরা হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে এ যুগের সাহিত্য রচনা করেছেন। আরব্য উপন্যাসের গল্প ও মধ্য প্রাচ্যের নানারকম রোমান্স আখ্যায়িকা মুসলমান লেখকদের হাত দিয়েই বাংলা উপন্যাসের আদিযুগ রচনায় সহায়তা করে। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতির পরিচয় শুধু মুসলমান লেখকদের রচনায় নয় মুসলিম জনসাধারণের চিত্রেও মেলে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন :

যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে
নির্ভরে শুনিলে যাহা কান্দয়ে যবনে।
যবনেহ যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে।

লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় পাঁচালি আর তর্জায় যাত্রা-অভিনয়ে আর ধর্মঠাকুরের গাজনে, কবিগান আর খেউড়ে। খাঁটি বাঙালী গানের ধারা চলতে থাকে কীর্তন ও বাউলে, জারি-সারি-ভাটিয়ালি বেদে গানে আর শ্যামাসংগীতে। লোকসাহিত্যের অপরূপ নিদর্শন মেলে গীতিধর্মী পল্লীকাব্যে।

মধ্য যুগে বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল নানা রকম কারুশিল্প ও কুটিরশিল্পে। মসলিন, রেশম, মৃৎশিল্প, সোনা-রূপা-কাঁসার কাজ, কাঠের কাজ—এ সমস্তই সারা ভারতের বাইরেও

প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এ ছাড়া চামড়ার কাজ, বেতের কাজ, লোহা ও ইস্পাতের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও নৌশিল্প ইত্যাদিরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। অঙ্কন ও ভাস্কর্য প্রভৃতি চারুশিল্পে এবং স্থাপত্যে বাঙালী সাধনার গৌরব বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। হাভেল্ সাহেব বলেন যে ভারতে মোগল ও পাঠান শিল্প আসলে হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পেরই রূপান্তর এবং হিন্দু শিল্পীদের গড়া মুসলমানী মসজিদের তুলনায় আরব, তুর্ক, মিশর ও স্পেনের মুসলমানী শিল্প ক্ষীণপ্রভ হয়ে পড়ে। মধ্য যুগের হিন্দু শিল্পীদের প্রতিভা স্বীকার করে আবুল্ ফজল্ লিখেছেন : 'এদের চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি আমাদের ধারণার অতীত।' মধ্য যুগের ভারতীয় শিল্পে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বচ্ছন্দ, অনায়াস, প্রাণবন্ত ভঙ্গী ও গতি ; এ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মোগল যুগের ভারতীয় শিল্পের কৃত্রিম সূক্ষ্মতা ও আদব-কায়দার বিরুদ্ধে একটি সজীব, আবেগময়, লীলায়িত বিদ্রোহ।

এক

আধুনিক সংস্কৃতির দুর্বলতা সত্ত্বেও এর ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। এই যুগে প্রাচীন ও মধ্য যুগের লোকসংস্কৃতি মরেনি, এখনো গ্রাম্যজীবনে বেঁচে আছে, যদিও তার অনেক প্রথা ও পদ্ধতি আজ লুপ্তপ্রায়। তবে এ কথা ঠিক যে, নতুন কোনো লোকসংস্কৃতি এই যুগে স্পষ্টভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। উচ্চতর কৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে দেশজ কৃষ্টির বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির আবির্ভাব। আধুনিক সংস্কৃতির বাহন তাই প্রধানত বিদেশী ভাষা; এর আত্মা হচ্ছে বৈদেশিক সভ্যতা। পূর্ববর্তী ধারা থেকে এই গভীর বিচ্ছেদের মূলে রয়েছে আধুনিক যুগের সমগ্র ইতিহাস, শাসনপদ্ধতি ও চিন্তাধারায় ইংরেজী তথা পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। ফলে আধুনিক সংস্কৃতির অনেকটাই দেশজ নয় এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে পরিপাক করে নেওয়াও দেড় শো বছরে সম্ভব হয়নি। কিন্তু শত ত্রুটি থাকলেও আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি হচ্ছে সারা ভারতের নব জাগৃতির ইতিহাস ও সম্পদ এবং এর প্রধান স্রষ্টা বাংলার ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক।

মধ্য যুগে বাংলার বৃহত্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গৌড়, নবদ্বীপ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ, যদিও বৈষ্ণব কবিরা নবদ্বীপের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেই বেশী উচ্ছ্বসিত হয়েছেন।[৫] কিন্তু আধুনিক যুগে বাঙালীর প্রায় সমগ্র সাধনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। সারা বাংলা কলকাতার দিকেই চেয়ে থাকে। ১৯৪৭এর বাংলাবিভাগের ফলে ঢাকা একটি রাজধানীতে পরিণত হলেও একাধিক কারণে ভারতের বিভিন্ন শহরের মতোই তার পক্ষে হঠাৎ আধুনিক মহানগরী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

অর্থনীতি ও বিজ্ঞান, গণতন্ত্রের আদর্শ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার সুযোগ—এই সমস্তই বাংলায় এই মহানগরী-সৃষ্টির ফল এবং এর জন্য সারা ভারতও অগ্রসর হয়ে গেছে কৃষ্টির পথে। মহানগরীর সভ্যতা আধুনিক যুগে সমগ্র বাংলার সাধনাকে আচ্ছন্ন করেছে, বিপন্নও করেছে একাধিক দিকে।

আধুনিক সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার না. করেও বলা যায় যে, এর ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়, এর রূপান্তর আবশ্যক ও অনিবার্য। তার কারণ হচ্ছে বর্তমান সামাজিক জীবনের অপূর্ণতা। ১৯১৪র মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই অপূর্ণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতালাভের পর সামাজিক জীবনের ভাঙন ও সংস্কৃতির সংকট হল স্পষ্টতর। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল কৃষ্টির বাহক ও প্রচারক; কিন্তু এখন সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভেঙে পড়েছে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় এবং বর্তমান পরিস্থিতির নিষ্ঠুর আঘাতে। আজো অবশ্য সাধনা চলেছে; কিন্তু সাধনার রূপান্তরও যে হচ্ছে তা বোঝা যায় শ্রেণীলোপের দ্রুতবর্ধমান সম্ভাবনায়, বিপ্লবী সমাজসৃষ্টির দাবিতে আর বামপন্থী কৃষ্টির সূচনায়।

দেড় শো বছরের আধুনিক সভ্যতা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে পরাধীনতা ও মূলগত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই সাধনা অভূতপূর্ব এবং এর জন্য সারা ভারত বাংলার কাছে ঋণী। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বাঙালী বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট থাকলেও এই বিরাট সাধনা সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত এবং সারা ভারতে সার্থকভাবে গ্রাহ্য ও গৃহীত। এই দীর্ঘ ও বিচিত্র সাধনার মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে: (১) পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে উপলব্ধি এবং প্রাচ্য সভ্যতার সঙ্গে মিশিয়ে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ; (২) বিজ্ঞানচর্চা ও বিভিন্ন বিভাগে বৈজ্ঞানিকদের অবদান; (৩) শিক্ষার প্রয়োজনবোধ ও প্রচার, নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

সংগঠন এবং বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতির চর্চা; (৪) রাষ্ট্রীয়-সামাজিক চেতনা ও আন্দোলন এবং সাংবাদিকতার প্রসার; (৫) নারীজাগরণ ও কর্মক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব; (৬) উচ্চতর সাহিত্যের বিপুল সাধনা; (৭) প্রাচ্য ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন কলাশিল্পের সৃষ্টি ও প্রচার—অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত; নৃত্যগীত চর্চা ও তার নতুনত্ব; নাটক, কথাচিত্র ও বেতারে নতুন কৃষ্টির সম্ভাবনা; (৮) সমাজ সংস্কার ও সেবাপ্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য সংগঠনী সাধনা; (৯) জড়বাদী যুগে আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা—রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত; (১০) ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের অজস্র অবদান।

দুই

ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে বাঙালীর সংস্কৃতিকে আধুনিক যুগে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়: ১৮০০-১৮৫৭; ১৮৫৭-১৯১৯; ১৯১৯-১৯৪৭। অবশ্য এ ধরনের পর্ববিভাগ খানিকটা কৃত্রিম হবেই কারণ রূপান্তর বছরের হিসাবে ঘটে না।

১৮০০-১৮৫৭: এ যুগের চিন্তানায়কেরা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে আবিষ্কার করলেন প্রাচ্য জীবনের অসম্পূর্ণতা। তাই প্রাচ্য জীবনকে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মধ্য দিয়ে নতুন করে গড়ে তোলাই হল তাঁদের সাধনা আর প্রথমেই তাঁদের নজর গেল সমাজ-সংস্কারের দিকে। এর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল, কারণ মোগল যুগের অবসানের সময়ে সারা দেশে এমন একটা মানসিক স্থবিরতা এবং সামাজিক অবনতি এসেছিল যাকে দূর করা একান্ত আবশ্যক হল। অবশ্য এই অভিযানে বাড়াবাড়ি খানিকটা হয়েছিল এবং অন্ধ

অনুকরণও যে হয়নি তা নয়। কিন্তু তাহলেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এ আন্দোলনের মধ্যে ছিল এক সুস্থ রূপান্তর ও গতিশীলতার ধারা।

এ যুগের বহু সাধকের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব দেখি রামমোহনের চরিত্রে। তাই ঘরে বাইরে তাঁর প্রতিভা সমভাবেই অনুভূত হয়েছিল। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাব ধারার সমন্বয়ে। হিন্দু-মুসলমান ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতিকে তিনি সার্থক-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন কোথায় তাঁর সমসাময়িক ভারতের গলদ আর অসম্পূর্ণতা। সেইজন্যই তাঁর চিন্তাধারা ও সাধনা সেদিনের বাংলায় বিপ্লবী মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িক সাধকেরা তাঁদের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে সমগ্রভাবে সচেতন থেকেও প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং সেইজন্যই বাঙালীর সাধনায় হয়েছিল ভারতের নব জাগৃতি। ধর্ম-সমাজ-শিক্ষায় সংস্কার, জাতীয় চেতনার উদ্রেক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংস্কৃতির স্থাপনা—এই ছিল রামমোহনের নব যুগের আদর্শ; অর্থাৎ একটি উদার বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে তিনি ভারতের রূপান্তর বা যুগবিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করলেন। এই সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির ফলেই ব্রাহ্মধর্মের সূচনা, সতীদাহপ্রথার সমাপ্তি এবং ইংরেজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রবর্তন। যুক্তি ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে রাম-মোহন হিন্দু. মুসলিম্, ক্রীশ্চান্ ধর্মের কুপদ্ধতিগুলি দূর করবার চেষ্টা করলেন। ধর্ম ও সমাজের সংস্কার (বিশেষত জাতিভেদলোপ ও সাম্প্রদায়িক সমন্বয়) তাঁর কাছে জাতীয় চেতনা থেকে পৃথক ছিল না।

তাঁর ধারণা ছিল সামাজিক ঐক্য ও সুস্থ সমাজব্যবস্থার ফলে জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক মুক্তি আসবে এবং স্বাধীন ভারতের চিন্তা তিনি একাধিক পত্রে ও কথোপকথনে প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে চিন্তা ও বিতর্কের উপযোগী গদ্যরচনাও তাঁর আর একটি ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। রামমোহনের মন সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে এ

দেশকে পরিচিত করেছিল বিদেশের কাছে আর বিদেশকে গ্রহণ করেছিল দেশী চিত্তের দিগন্তবিস্তারের জন্য। চীন, স্পেন, গ্রীস, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স—সর্বত্রই সংস্কার ও বিদ্রোহের আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা রামমোহনের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। স্প্যানিশ ভাষায় লেখা একখানি বই তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল; ইংল্যাণ্ডে শাসক ইংরেজ সমাজেও তিনি ছিলেন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। স্যার জন্ বৌরিং, রেভ্‌রেণ্ড পোর্টার্, ডক্টর বুট, দার্শনিক বেন্থাম প্রভৃতি ইংরেজরা যে ভাষায় রামমোহনকে প্রশংসা করেছেন তাতে তাঁকে মহামানব বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রামমোহন ভারতীয় নব জাগৃতির প্রথম ও পূর্ণ প্রতীক, কিন্তু তাঁর যুগে বিরোধী লোকের অভাব ছিল না আর এই প্রাচীনপন্থীদের তীব্র বিরোধিতার জন্যই বিরাট ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও রামমোহনের প্রভাব খানিকটা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তিন

দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হিন্দু কলেজ। প্রথমটির মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রচুর আদানপ্রদান ও সমন্বয় হয়েছিল এবং বহু ইংরেজের সহযোগিতায় সংস্কৃতির বিকাশ দেখা দিয়েছিল প্রাচ্য গবেষণা, গদ্য-রচনা ও সাংবাদিকতায়। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হেয়ার, কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি ইংরেজের দান অমূল্য। হিন্দু কলেজ গেল অন্য পথে। এখানকার চিন্তানায়ক ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষক ডিরোজিও। ডিরোজিওর ছাত্রেরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাতি ও কুখ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা ছিলেন স্বাধীন চিন্তার বাহক। প্রাচ্য সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইংরেজদের একটা

আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজের বাঙালী ছাত্রেরা 'স্বাধীন চিন্তা' অবলম্বন করে প্রাচ্য ভাব ও হিন্দুত্বকে এমন ঘৃণা করতে শিখল যে তাদের কেউ কেউ খৃষ্টধর্মী হয়ে পড়ল। এদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন। শিক্ষাপ্রসারে ও নারীজাগরণে বাঙালী ক্রীশ্চানদের সাহায্য হয়েছিল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। ডিরোজিয়েরা—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র ইত্যাদি—তৎকালীন বাংলায় বেশ একটা সাড়া এনে দিলেন। এঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা প্রকাশ পেল প্রধানত বক্তৃতা ও সাংবাদিকতায়। এ দুটি বস্তুরই আরম্ভ হয়েছিল রামমোহনের সময়ে এবং পরবর্তী যুগের বাঙালী ও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি এ দুটি বস্তুর কাছেই যথেষ্ট ঋণী।

শিক্ষাব্যাপার ও সমাজসংস্কারে উগ্রতা বর্জন করে আরো দুটি সমাজসেবী দল গড়ে উঠল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা জাতীয় ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে সমাজদৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুচরেরা নজর দিলেন শিক্ষাপ্রচার, বাংলা গদ্যরচনা, স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহরোধ ও বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন প্রভৃতির দিকে।

১৮৫১ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠায় দলগত-ভাবে রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনের চেষ্টা দেখা গেল। অবশ্য এর আগেই রামগোপাল ঘোষের অধিনায়কত্বে 'কালো আইন' আন্দোলন হয়েছিল। এইভাবে শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার ও স্বল্প রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির প্রথম পর্ব শেষ হল ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহে। সেই বছরেই স্থাপিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮৫৭-১৯১৯ : সিপাহী বিদ্রোহ যে বাঙালী মধ্যবিত্তের সহানুভূতি পায়নি তা বোঝা যায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা প্রভৃতি তৎকালীন রচনা থেকে। সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙালী সংস্কৃতি একটু স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু চেতনা আনল ১৫৮৯এর নীলকর আন্দোলন যার চিত্র মেলে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। নীলকর আন্দোলনের বিশেষ মূল্য গণচেতনার আবির্ভাবে।

দ্বিতীয় পর্বের মূল ধারাগুলি হল : ধর্মচেতনা, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষার বিস্তার ও মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টি ও শিল্পগঠন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ধর্মান্দোলনের পুনরাবির্ভাব হল বাংলায়। এর একটি ধারার নেতা হলেন কেশবচন্দ্র এবং তাঁরই নেতৃত্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম সমাজসংস্কারে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠল। প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজও নিজেকে বিপন্ন মনে করে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন কি রাজনীতিতেও হিন্দুত্বের প্রচার আরম্ভ করল। হিন্দুত্বের নেতা হলেন এ যুগে রামকৃষ্ণ, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে ও ব্যাখ্যায় সংকীর্ণতা ছিল না ; তাঁর উদার মতের ফলে হিন্দুত্বের খানিকটা সংস্কার হল। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের যে আন্দোলন তা যে বিশেষ সময়োপযোগী হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই আন্দোলনের চাপে বাঙালী সমাজের ও হিন্দুধর্মের সংস্কার হয়েছিল এক দিকে ; অপর দিকে এর ফলে খৃষ্টধর্মের প্রসার অনেকখানি কমে গিয়েছিল। মুসলিম ধর্মমতের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল এই যুগে ওয়াহাবি আন্দোলনে এবং এর প্রভাব এসে পৌঁছল রাজনীতির ক্ষেত্রেও।

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব রোমাঁ রল্যাঁর মতো পাশ্চাত্ত্য

মনীষীও স্বীকার করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য বোধহয় বিবেকানন্দেরও কম নয়। আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ফল হল অন্য রকম। রামমোহনের মতো তিনিও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে হিন্দুত্বের প্রতিনিধি। অবশ্য বিবেকানন্দের মধ্যে প্রাচ্য গোঁড়ামি ছিল না; পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে তিনি প্রাচ্যের দোষ স্পষ্ট-ভাবেই দেখিয়েছেন। রামকৃষ্ণের ধর্মচেতনা ছিল মূলত অন্তর্মুখী, কিন্তু বিবেকানন্দ তাকে চাইলেন সামাজিক জীবনেও সার্থক করে তুলতে। ফলে আদর্শবাদী কর্মনিষ্ঠা, সমাজসেবা, দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিগঠন হল (বিবেকানন্দের মতে) একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন। এ যুগের 'হিন্দু মেলা' আন্দোলন মূলত ধর্মান্দোলন না হলেও এর আংশিক উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্বের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করা।

এদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তার চরম উত্তেজনা এল বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই রাজনৈতিক চেতনা দলগত রূপ ধারণ করে ও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদে পরিণত হয় এবং তার পরে প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে বাঙালী রাজনীতির মূল ধারা শেষ হল গান্ধিজীর আবির্ভাবে।

এর মধ্যে একটি উচ্চ স্তরের সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে এবং শিক্ষা-জগতে আবির্ভাব হয়েছে আশুতোষের এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্টি-অভিযানের। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিদ্যা-চর্চার ফলে শুধু বাঙালী সংস্কৃতি নয় সারা ভারতও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। আধুনিক সংস্কৃতির গোড়া থেকেই বাঙালীর নেতৃত্ব সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃত হয়েছিল এবং কৃষ্টির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতের সর্বত্র বাঙালীর অবদান ছড়িয়ে পড়ল। ভারতে বাঙালী কৃষ্টি-নেতৃত্বের চূড়ান্ত অবস্থা এসেছিল বোধহয় এই দ্বিতীয় পর্বে।

১৯১৯-১৯৪৭ : সংস্কৃতির এই পর্বে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠলেও সাধনার ধারা নানা পথে বৈচিত্র্য লাভ করতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির আদর্শে পরিণত হয় এবং বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন গণচেতনার সঞ্চার করে। কিন্তু এই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির ফলে হিন্দু-মুসলমানের কৃত্রিম স্বার্থবিরোধ সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী রূপে সমস্ত জাতীয় জীবনকে দুর্বল করে ফেলতে থাকে। মুসলিম মধ্যবিত্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৃত্রিম ইসলামী সংস্কৃতির সাধনা আরম্ভ হয় এবং তার ভিত্তি-হীনতাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তা হলেও একাধিক মুসলিম কবি ও লেখকের রচনায় বাংলার যৌথ সংস্কৃতি অনেক দিন পরে পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে।

সংস্কৃতির এই পর্বে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে নারী-জাগরণ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দিক থেকেই এই ধারার আরম্ভ এবং দ্বিতীয় পর্বে তার ফল স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রীশ্চান ও ব্রাহ্ম সমাজের কাছে এ বিষয়ে বাঙালী সংস্কৃতি বিশেষভাবে ঋণী। তৃতীয় পর্বে সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে দ্রুতবর্ধমান নারী-অবদান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাঙালী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বাঙালী মেয়েদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে। এই সূত্রে এই কথাও মনে রাখা উচিত যে ভারতের নানা স্থানে বাঙালী মেয়ে আজো কৃষ্টির বাহক।

সমাজসেবার যে ধারা রামমোহনের সময় থেকে আরব্ধ হয়ে বিবেকানন্দের যুগে প্রায় একটি ধর্মের মর্যাদা লাভ করে তার বিশেষ পরিপুষ্টি হয় তৃতীয় পর্বে এবং নানা রকম সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অপর দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ব-ভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য ছোট-বড় নানা

রকম সংস্কৃতিপ্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও বাঙালীর মানস চর্চাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করে।

এই যুগের সাহিত্যিক সাধনা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী লেখক-দের মধ্যে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে নতুন নতুন ভাবের গ্রহণে ও আঙ্গিকের অনুশীলনে ব্যাপক হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় দ্রুতবর্ধমান সাময়িক সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কথা। অবশ্য শেষেরটি ভেদবুদ্ধির যুগে অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন দিয়ে ভারতীয়তা ও সংস্কৃতির ক্ষতি করেছে। নানা রকম প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের কল্যাণে সংগীত, কলাশিল্প ও নৃত্য ভারতীয় ও প্রাচ্য রীতির পুনরুজ্জীবন করে নব কৃষ্টির আন্দোলন আনে। নব নাট্য রচিত হয় আর আসে নতুন অভিনয়পদ্ধতি।। কথাচিত্র ও বেতারেও ভবিষ্যৎ কৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। মূল সূত্রটি তাহলে হল এই যে, মধ্যবিত্ত বাঙালী পাশ্চাত্ত্য সাধনার ব্যাপক উপলব্ধি প্রয়োগ করেছে সংস্কৃতির সমগ্র ক্ষেত্রে এবং তার সঙ্গে চেষ্টা করেছে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাধনাকে আত্মসাৎ করে তার সনাতন সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারাকে সার্থক করে তুলতে। তাই এই যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উদারতার অভাব হয়নি এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্টির সূচনা রয়েছে। এর জন্য প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বপ্রেরণাই দায়ী এবং সারা ভারত আজো বাংলার কাছে নব কৃষ্টির জন্য ঋণী।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম থেকেই বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংকট মর্মান্তিক স্পষ্টতা লাভ করতে থাকে : এর প্রধান কারণ হল সাম্প্রদায়িকতা ও আর্থিক বিপর্যয়;, তার পরে এল ১৯৩৯এর মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর। ভাঙনের ষোলো কলা! কিন্তু নানা রকম বিক্ষোভ ও অসন্তোষের পটভূমিতে নৈরাশ্যবাদ ও পরাজয়-মনোবৃত্তির সঙ্গে গজিয়ে উঠল গণজাগরণের বিপ্লবী আদর্শবাদ আর আজ ঘুণ-ধরা মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে এই আন্দোলন গ্রহণ করতে

চলেছে। এর ফল ভালো না মন্দ তার বিচার এখানে করা সম্ভব নয়; তবে একটা বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন যে আসন্ন তা ঘটনার পদক্ষেপ থেকেই বোঝা যায়। কৃষ্টির ক্ষেত্রে এর প্রাথমিক মূল্য রয়েছে লোকসংস্কৃতির বিপ্লবী পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনায়।

এই পর্বের ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি আনল বাঙালী জাতীয়তার অপমৃত্যু, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে ১৯৪৭এর আত্মঘাতী বঙ্গবিভাগ।

সংস্কৃতির বৈচিত্র্য

এক

হাজার বছরের প্রায় অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ করলে বাঙালীর বিরাট সাধনায় যা প্রথমেই নজরে পড়ে তা হচ্ছে অজস্র বৈচিত্র্য। ভারতের আর কোনো প্রদেশে বোধহয় সংস্কৃতির এ রকম অখণ্ডতা ও অপরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায় না। তা ছাড়া আর কোনো প্রদেশের সংস্কৃতি এমন সার্থকভাবে ভারতের অবশিষ্টাংশে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই বিপুল সাধনাবৈচিত্র্যকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ না করে একে ব্যাপকভাবে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—লোকসংস্কৃতি ও উচ্চতর সংস্কৃতি। অবশ্য এ দুটির পরস্পর সম্পর্ক অনস্বীকার্য আর তা ছাড়া লোকসংস্কৃতির অনেক বস্তুতেই সমাজের সব শ্রেণীরই স্থান রয়েছে। সুপ্রচলিত ও পরিচিত বিষয়-গুলির তালিকা থেকেই বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাবে।

লোক-সংস্কৃতি :

(১) ব্যাপক অর্থে কারুশিল্প : খড়ের চালের কুটির; বেত ও বাঁশের কাজ; কাঠের কাজ; ইটের কাজ—নানা রকমের খোদাই; নানাবিধ মৃৎশিল্প; শাঁখের কাজ; পিতল-কাঁসা-লোহা-ইস্পাত প্রভৃতির ধাতব শিল্প; সোনা-রূপা-সোলা ইত্যাদির অলংকার-শিল্প; বিবিধ বস্ত্রশিল্প; মাদুর, শীতলপাটি ইত্যাদির কাজ; হাতির দাঁতের কাজ ও প্রস্তরশিল্প; চিত্রকলা—নানা রকমের পট, দেয়ালে ও মৃৎপাত্রে এবং চালচিত্রে অঙ্কন; আলপনা; কাঁথা সেলাই; নৌশিল্প ও মধ্য যুগের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ-শিল্প।

(২) অনুষ্ঠান : নানাবিধ ব্রত, পার্বণ ও উৎসব—পৌষপার্বণ, নবান্ন; সামাজিক অনুষ্ঠান—বিবাহের স্ত্রী-আচার ইত্যাদি, জামাই-ষষ্ঠী, ভাইফোঁটা, অন্নপ্রাশন, বিজয়া-সম্মিলন; পূজা—দুর্গা, কালী,

সরস্বতী, লক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ, বিশ্বকর্মা, ধর্মঠাকুর, দোল, রাস; আনুষ্ঠানিক ক্রীড়া ইত্যাদি—রায়বেঁশে নাচ, আরতি-নৃত্য, ব্রত-নৃত্য; বাংলার বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র রন্ধনরীতি।

(৩) মানসিক ও কলাগত সংস্কৃতি : বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মসংস্কৃতি —বৈষ্ণব, শাক্ত, সহজিয়া, বাউল ইত্যাদি; কাহিনী ও উপাখ্যান —ব্রতকথা; পৌরাণিক কথকতা—বেহুলা-লখিন্দর-কালকেতু-ফুল্লরা-রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ী গল্প; সাহিত্য—ধর্মকাব্য, ছড়া, বচন, রামায়ণ, মহাভারত ও পল্লীকবিতা; আমোদপ্রমোদ—তর্জা, পাঁচালি, যাত্রা ইত্যাদি; গান—কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী, জারি, সারি, ঝুমুর, টপ্পা, ঢপ, খেমটা ইত্যাদি।

উচ্চতর সংস্কৃতি :

(১) বিদ্যাচর্চা : নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের অবলম্বনে শিক্ষাদান ও গবেষণা; কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনা; বিশ্বভারতীর প্রাচ্য ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিচর্চা।

(২) ধর্ম ও সমাজ : শ্রীচৈতন্য থেকে আরম্ভ করে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত ধর্ম-ও-সমাজ নিয়ে বাংলায় যে সংস্কার-সাধনা হয়েছে তার আধ্যাত্মিক মূল্য আজো সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়নি। সংস্কৃতির এই ক্ষেত্রে প্রধান নায়কেরা হলেন শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ।

(৩) রাজনীতি : রাজনৈতিক সাধনার ক্ষেত্রে বাংলার অবদান আর যে কোনো প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশি। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক চেতনাই বাঙালীর সৃষ্টি। জাতীয় আন্দোলনের সব পর্যায়েই আর কোনো একটি প্রদেশ থেকে এতগুলি নেতার উদ্ভব হয়নি, যেমন হয়েছে বাংলা থেকে। অসংখ্য কর্মী, সাধক ও নেতাদের মধ্য থেকে যে কয়জন ভারতীয় রাজনীতিকে গঠন করেছেন বা রূপান্তর দিয়েছেন তাঁদের নাম হল সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্র-মোহন, সরোজিনী, সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ।

(৪) সাহিত্য : বাঙালী সংস্কৃতির অনুপম পরিচয় সাহিত্য। অন্যত্র এর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। অসংখ্য সাহিত্য-সেবকদের মধ্য থেকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে যাঁদের স্থান নিঃসন্দেহে হয় তাঁরা হচ্ছেন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।

(৫) কলাশিল্প : আধুনিক ভারতে কলাশিল্পের নবজন্ম হয়েছে বাংলায়। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও তাঁদের অসংখ্য শিষ্যেরা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে প্রাচ্য রীতির প্রবর্তন করেছেন নতুন খাতে। বাংলার অসংখ্য শিল্পীদের মধ্যে বর্তমানে বাংলার মৌলিক পদ্ধতিকে নব রূপ দিয়েছেন যামিনী রায়।

(৬) সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি : রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সঙ্গীত ও তার প্রভাবে শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতেই নব সঙ্গীতের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন সঙ্গীতের পদ্ধতি থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা পৃথক। এখানে স্বাভাবিক আবেগ, রসানুভূতি, কল্পনা ও ভাষা মিশে গেছে সুরের স্রোতে। প্রাচীন কাঠামোকে অস্বীকার না করেও এই গান যেন সুরলক্ষ্মীর লীলায়িত বিদ্রোহ। নৃত্যকলায় যুগান্তর এনেছেন উদয়শঙ্কর এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়েছেন অসংখ্য শিল্পী। ভারতের এবং প্রাচ্যের নানা রকম নৃত্য পদ্ধতিকে এঁরা সঞ্জীবিত করেছেন এঁদের প্রতিভা ও কল্পনার দ্বারা। শিশিরকুমার ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনেছেন অভিনয়-পদ্ধতিতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাট্যও নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছে। গণচেতনার সূচনা দেখা দিয়েছে গণনাট্যরচনায়। ছায়াচিত্র ও বেতারও কৃষ্টির সার্থক মাধ্যম হতে চলেছে।

(৭) প্রতিষ্ঠান : উচ্চতর সংস্কৃতি যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার লক্ষণ দেখা যায় বিভিন্ন সামাজিক ও সেবা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবে। আরও একটা স্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে বহুবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে—নৃত্যগীতের আসর, আলোচনার বৈঠক ইত্যাদি।

দুই

বাংলার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমন্বয়ের মৌলিক দুঃসাহস আর আর্যবিরোধী উদার মনোময়তা, মানবপন্থী ধারা ও গৃহী মনের বৈরাগী অনুভূতি, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে অতীন্দ্রিয়তার উপলব্ধি। বাঙালীর অধ্যাত্ম-জীবন সনাতন ব্রাহ্মণ্য থেকে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে বৈচিত্র্যে আর গূঢ় রহস্যের সন্ধানে। স্থবির আচারনিষ্ঠা তাই পরিবর্তনশীল আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার কাছে স্থায়ী ও সুদীর্ঘ আবেদন রাখতে পারেনি। বাঙালীর রক্তও তার ধর্মবিশ্বাসকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। তার রক্তে যে আদিম প্রাক্-আর্য তমসাচ্ছন্ন তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় স্পৃহা রয়েছে তারই নিরন্তর তাড়নায় হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব সব ধর্মমত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই তীব্র আবেগ সনাতনী ধর্মে নেই।

একটা আধ্যাত্মিক অসন্তোষ ও সন্ধানস্পৃহা বাঙালী মনকে ছুটিয়েছে নতুন নতুন, গূঢ় হতে গূঢ়তর, সহজ থেকে জটিল সাধনপদ্ধতির পথে। ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের দুঃসাহসিক সমন্বয়ের চেষ্টায় তাই সময়ে সময়ে সমাজবিরোধী ব্যভিচার ঘটেছে। বাংলার বৌদ্ধ ও শাক্ত তান্ত্রিকদের উৎকট ও ভীষণ সাধনা ও বৈষ্ণবদের কলঙ্ক তার প্রমাণ। গোপন কায়াসাধন, অভিনব দেহতত্ত্ব, শূন্যধ্যান, নারীসাধন ও শবোপাসনা ইত্যাদি পদ্ধতির মধ্যে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলেছে ধর্মের তুরীয় ভঙ্গী।

বৈচিত্র্য আর রূপান্তর! মানবপন্থী বাঙালী মন অধ্যাত্ম-জীবনের লক্ষ্যকে নানা রকম মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে সন্ধান করেছে—পিতা ও মাতা, পতি ও পত্নী, সখা ও সন্তানের রূপে। ভারতের আর কোনো প্রদেশে হিন্দু দেবদেবী এমন ঘরের মানুষ হতে পারেননি। আউল, বাউল, নাথ, অবধূত, কর্তাভজা, বৈষ্ণব, পাঁচুফকিরী, খুসী-বিশ্বাসী, সহজিয়া প্রভৃতি অসংখ্য ধর্মমত ও ধর্মসংঘের মধ্যে পাই বাঙালী ধর্মসংস্কৃতির রূপান্তর আর প্রাণবন্ত গতি।

আর্য ব্রাহ্মণ্যের যাগযজ্ঞনিষ্ঠা বাংলায় প্রচলিত থাকলেও বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবিরোধী ধর্মের সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে। তাই শাস্ত্রপন্থী ভারত বাঙালী হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু বলে মানতে অস্বীকার করে। বাংলার নিজস্ব ধর্মসাধনার গুরু বহু ক্ষেত্রেই কোনো পণ্ডিত নন, প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষাহীন সহজ মানুষ। প্রেম ও ভক্তির পথে তাই বাংলার ধর্মসাধনার গতি। শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব সবের মধ্যেই রয়েছে প্রেমের আবেগ। কৃষ্ণভক্তি বাংলায় প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত, কিন্তু সেই ভক্তি রামানন্দ-মাধব-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বার্ক রীতির বাইরে। বাঙালী বৈষ্ণব মতের মূল সূত্র হচ্ছে নরলীলার মধ্যে প্রেমভক্তিজড়িত আত্মসমর্পণের নিবিড় অনুভূতি; আর এই বৈষ্ণব মতের মধ্যেই রয়েছে বাউল পন্থার পূর্বাভাস। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই বৈষ্ণব সূত্রের মধ্যেই আছে বাউল মনের পূর্ণ পরিচয়। বৈষ্ণবেরা শাস্ত্র ও বিধি হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি গ্রহণ করেননি, কিন্তু বাউল পন্থায় রয়েছে এই মুক্তির চরম ইঙ্গিত। বাউলরা তাই বিধিনিষেধ বা জাতিধর্মের ভেদাভেদ মানেন না। এঁরা প্রাণবন্ত সহজ মানুষ:

তাই তো বাউল হৈনু, ভাই।
এখন বেদের ভেদবিভেদের
আর তো দাবিদাওয়া নাই।
গতাগতের বাঁধা পথে
আজায় না ঘাস কোনো মতে।

'নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম'—এই হল বৈষ্ণব জীবনের মূল আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই প্রেমের পথে মানবতার জয়গানই হল বাউলের জীবন। বাউলী মানবধর্মের ধারা রূপ নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে:

রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে ?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পুজিস সংগোপনে ?
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে—
দেবতা নাই ঘরে।

সমন্বয় ও রূপান্তর বাংলার নিজস্ব প্রতিভা। বর্ধমান, বীরভূম, বিক্রমপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় এককালে বজ্রযান দেবদেবীর পূজা সুপ্রচলিত ছিল ; তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাধনকেন্দ্র ছিল কামাখ্যা আর শ্রীহট্ট। কিন্তু প্রেম ও ভক্তির রসে রূপান্তরিত হয়েছে বজ্রযান, সহজযান ও একাভিপ্রায়ী পদ্ধতি। শাসকের ধর্ম হয়ে ইসলাম যখন এল বাংলায় তখনও বাঙালীর মন তাকে পরিপাক করে সমন্বয়ধর্মের সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে। গুরুবাদ ও স্তূপ-উপাসনা ইসলামের সংস্পর্শে এসে পীর ও গোর-পিরস্তির সঙ্গে মিশেছে। সমন্বয়ের ফলে উদ্ভব হয়েছে সত্যপীর, মাণিকপীর ও কালুগাজির মতো মিশ্রদেবতার। শীতলা, রক্ষাকালী ও মনসা মুসলমানের পূজা পেয়েছেন আর মসজিদে মানত করেছে হিন্দু। বৈষ্ণব, সহজিয়া ও বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মিশে গেছে। বিজয়ী ইসলামের সামনে সনাতন ব্রাহ্মণ্য শুধু বিধিনিষেধের দ্বারা বাংলার কোমল মাটিতে তার সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না যদি চৈতন্যের মতো যুগাবতারের আবির্ভাব না হত। 'যবন হরিদাস চৈতন্যের নতুন সমাজের মানুষ।' এই সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল বলেই রামেশ্বর ভট্টাচার্য লিখলেন : 'অতঃপর বন্দিব রহিম রাম রূপ।' 'পীর বাতাসী'র মুসলমান গায়েন তাই মক্কা মদিনার সঙ্গে কাশী ও গয়াকেও তাঁর তীর্থস্থান বলে বন্দনা করেছেন আর চট্টগ্রামের মুসলমান পল্লীকবি 'সীতা মা'কে প্রণাম জানিয়েছেন।

ইংরেজী আমলে যখন য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে খৃষ্টধর্মপ্রচার

আরম্ভ হল তখনও নতুনভাবে খাঁটি হিন্দুত্বের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মে, রূপান্তর দেখা গেল প্রচলিত হিন্দুত্বের সংস্কারে ও সেবাধর্মের সৃষ্টিতে। রামমোহন ও কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সনাতন বাঙালীর মানবতার মধ্য দিয়েই ধর্মসংস্কৃতির পথ নির্দেশ করেছেন। মানবতার মধ্যে দৈব জীবনের উপলব্ধি করেই বাংলা ও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান ভারতের ধর্মগুরু।

তিন

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই হচ্ছে বাঙালীত্বের ও বাঙালী সংস্কৃতির দৃঢ় বনিয়াদ। এই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই বাংলার নিজস্ব প্রতিভা ও আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়েছে; তাই এ দুটি যতদিন জীবন্ত ও প্রগতিশীল থাকবে ততদিন শুধু সংস্কৃতি নয় সমগ্র বাঙালী জীবন ভরসা পাবে। বর্তমান ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই বাংলা সাহিত্য যার স্থান বিশ্বের দরবারেও স্বীকৃত হয়েছে। কিছুদিন আগে বিখ্যাত য়ুরোপীয় পণ্ডিত অধ্যাপক তুচি ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় অবদানের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় সংস্কৃতি বুঝতে হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জানা একান্ত আবশ্যক। তিনি বলেন যে বাংলায় এমন বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেগুলির অনুবাদে সারা পৃথিবী উপকৃত হবে।

যুগে যুগে বাংলা লিপির পরিবর্তন হলেও অক্ষরের সাদৃশ্য অস্পষ্ট নয়। আর্যেরা বাংলায় আসবার আগে এখানকার অধিবাসীদের ভাষা কী রকম ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে সে ভাষার রূপ যে সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ—এই ধারার মধ্য দিয়ে

বাংলার জন্ম হয়। এর প্রাচীনতম নিদর্শন যা পাওয়া যায় তা দশম শতাব্দীর আগের বলে মনে হয় না। এ যুগে শৌরসেনী অপভ্রংশও ব্যবহৃত হত। বেশ বোঝা যায় কোনো একটি ভাষা এ যুগের সাহিত্যের মাধ্যম ছিল না। আঞ্চলিক ভাষা যে অনেক ছিল তার প্রমাণ মেলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাগত পার্থক্যে। অবশ্য সংস্কৃত থেকে বিচ্ছেদ কোনো যুগেই হয়নি।

আধুনিক বাংলা ভাষা গড়ে ওঠে দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি। এ ভাষার নিদর্শন মেলে ধর্মসম্বন্ধীয় নানা রকম সাহিত্যে। মুসলমান আমলে এ ভাষার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়, কিন্তু গদ্যের ভাষা পরিণতি লাভ করেছিল আরো অনেক পরে, ইংরেজের যুগে। বিভিন্ন জাতির আগমনে, বিশেষত মুসলমানী প্রভাবে, বাংলা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতোই আরবী, ফার্সি, পোর্তুগীজ ইত্যাদি বৈদেশিক ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। হিন্দী ও উর্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা থেকেও শব্দ গৃহীত হয়। পরবর্তী যুগে ইংরেজীও বাংলার সমৃদ্ধির একটি প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। ইংরেজীর প্রভাব শুধু শব্দকোষেই আবদ্ধ থাকে না; বর্তমানে বাংলা ভাষার গঠনরীতি ও ভঙ্গীও প্রভাবান্বিত হয়েছে। এই প্রভাব ইংরেজীশিক্ষিত লেখকদের মারফত ধীরে ধীরে ভাষার রূপান্তর আনছে। আর একটা কথা: স্বাধীনতার পরে উগ্র স্বদেশীয়ানার উৎপাতে অকারণ, অসম্ভব ও অদ্ভুত পরিভাষার সৃষ্টি না করে আমাদের উচিত বৈদেশিক শব্দগুলিকে আত্মসাৎ করা, যেমন করেছে ইংরেজী ভাষা।

ভারতীয় সভ্যতার বাহন ছিল সংস্কৃত। সে ভাষা আজ অপ্রচলিত হলেও তার প্রভাব বাংলায় আজো জীবন্ত। নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি ও ভাষার ব্যঞ্জনায় সংস্কৃতের সাহায্য অপরিহার্য। কিন্তু এটা ঠিক যে বাংলা ভাষার একটা স্বতন্ত্র আত্মা বা প্রতিভা আছে। এর গতিভঙ্গী সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধিনিষেধ মানে না।

কাব্যের ভাষা মধ্য যুগে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও গদ্য ভাষার পরিপুষ্টি শুরু হয় ইংরেজী আমল থেকে, বিশেষ করে মিসনারি সাহেবদের চেষ্টায়। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা গদ্য ও কাব্যের ভাষা ছিল সংস্কৃতেরই অনুকরণ। এরই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল একদল লেখকের রচনায়; এঁরা কথ্য ভাষা ও সংস্কৃতধর্মী লেখ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্যের অতিরিক্ত কৃত্রিমতা বর্জন করে 'চল্‌তি' ভাষা শুরু করেন। পরে অবশ্য একটা আপোশ হয় এবং সেই আপোশের ভাষা আজো চলেছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষত প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে, 'চলতি' ভাষার দিকে মোড় ফিরছে। অবশ্য নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করবার সময়ে এখনো প্রধানত সংস্কৃতের সাহায্য নিতে হয়, কিন্তু ভাষার 'মেজাজ' যে বদলাচ্ছে তাতে আর সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে ব্যাকরণ ও বানান সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য ও পরিবর্তন। বাঙালীর প্রাণধর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বোধ হয় তার প্রগতিশীল ভাষা ও সাহিত্য।

চার

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজী আমলের আগে বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল ধর্ম। সাহিত্যের এই দীর্ঘ ধারা বিভিন্ন ধর্মমত আশ্রয় করে আধ্যাত্মিক জীবনকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমাজ ও মানবিক প্রেরণা অবহেলিত হয়নি। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়, তার আশা-ভরসা ও সুখ-দুঃখের পরিচয় মেলে। সমাজবিক্ষোভ, সমাজের পরিবর্তন ও রীতিনীতি এ সবেরই পরিচয় পাই সাহিত্যে। ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তি— এই তিনের মিশ্রণ অল্পবিস্তর সর্বত্রই দেখা যায়। সাধারণত সাহিত্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ধর্ম-সম্বন্ধীয়, (২) সমাজপ্রধান,

(৩) ব্যক্তিগত। সাহিত্যকে আবার অন্য ভাবেও ভাগ করা যায়: (১) উচ্চতর সাহিত্য, (২) লোকসাহিত্য। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এ ধরনের ভাগাভাগি খানিকটা কৃত্রিম হবেই; তবে ধারাগুলো লক্ষ্য করবার পক্ষে এরকম ভাগ অনেকটা সাহায্য করে।

দশম শতাব্দীর কাছাকাছি রচিত চর্যাপদগুলিকে প্রাচীনতম বাঙালী সাহিত্য বলে মেনে নিলে দেখা যায় যে, এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে সহজিয়া বৌদ্ধমতের বা ঐ ধরনের ধর্মমতের গূঢ় ব্যাখ্যা। অবশ্য অদীক্ষিত ব্যক্তির কাছে এর আধ্যাত্মিক অর্থ স্পষ্ট হয় না; তবে সংকেত সাহিত্য হিসাবে এর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ:

চান্দ সূজ দুই চাকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহ তু ছন্দা॥

চাঁদ-সূর্য দুই চাকা, সৃষ্টি-সংহার মাস্তুল। বাম ডাহিনে দুই মার্গ বোধ হয় না। স্বচ্ছন্দে বেয়ে চল।

যে ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গেছে তার প্রত্যেকটিতে আছে চার থেকে ছয়টি পদ। জানা যায় যে এগুলির রচয়িতা ছিলেন বারোজন সিদ্ধগুরু। পরবর্তী যুগের নানা রকম ধর্মসাহিত্যের সূচনা হিসাবে এবং লুপ্তপ্রায় ধর্মমতের রহস্যসন্ধানের দিক দিয়ে এগুলির মূল্য অসামান্য।

মধ্য যুগেই খাঁটি বাংলা সাহিত্যের শুরু হয়। এই যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে নানা রকম মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রধানত মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরকে অবলম্বন করে রচিত। লৌকিক ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান হচ্ছে এদের উপাদান, কিন্তু সমসাময়িক সমাজের চিত্র এখানে বেশ নিপুণভাবেই আঁকা হয়েছে। এই রচনাগুলি গীতিধর্মী নয়, মূলত কাহিনীকাব্য। বিভিন্ন লোকের হাতের রচনা হলেও কয়েকটি চরিত্রের জীবনই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে—(১) মনসামঙ্গল কাব্য (বিজয়গুপ্ত ও কেতকা দাস ইত্যাদির রচনা): চাঁদ সদাগর, লখিন্দর ও বেহুলা;

(২) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও মুক্তারাম সেন প্রভৃতি); কালকেতু, ফুল্লরা, শ্রীমন্ত, খুল্লনা ইত্যাদি; (৩) ধর্মমঙ্গল কাব্য (রামাই পণ্ডিত, মাণিক গাঙ্গুলি, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি): রঞ্জাবতী ও তাঁর পুত্র লাউসেন; (৪) অন্যান্য মঙ্গলকাব্য—শীতলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল (ইংরেজী আমলের সূচনায় ভারতচন্দ্রের লেখা) ইত্যাদি।

মধ্য যুগে বৈষ্ণবধর্ম আবির্ভূত হবার পর এই ধর্ম এবং শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ভক্তদের জীবন নিয়ে এক বিরাট সাহিত্য গড়ে ওঠে। কাহিনী, কীর্তন, চরিতমালা, পদাবলী ইত্যাদিতে এর সমৃদ্ধি বোঝা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে সমসাময়িক যুগের সমাজ-ও-ধর্মবিপ্লবের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্মী রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মানবিকতা। ভক্তি, প্রেম ও রসমাধুর্যের গুণে এই সাহিত্য অনুপম। এই সাহিত্যের সাধকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জয়ানন্দ, বৃন্দাবনদাস ইত্যাদি।

এ ছাড়াও নানা রকমের সাহিত্য ছিল। নাথসাহিত্যের নিদর্শন মেলে গোরক্ষবিজয় কাহিনীতে ও ময়নামতীর গানে। বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের মিশ্রণে নাথসম্প্রদায়ের যে মতবাদ গড়ে ওঠে তাকেই অবলম্বন করে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এই সাহিত্য গড়ে তোলেন—যেমন ভবানী দাস ও শেখ ফয়জুল্লা। ছড়া ও প্রবাদবচন ইত্যাদির মধ্যে লোকসাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ; কিন্তু এ দুটি রচনায় মূল সংস্কৃত কাব্য থেকে যে পার্থক্য দেখা যায় তাতে বাঙালী মনের ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। লোকসাহিত্যের উৎকর্ষের নিদর্শন বিভিন্ন অঞ্চলের পল্লীগাথা। এই সব কবিতায় ও গানে পল্লীসমাজ, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও হৃদয়াবেগ অতি সরল ও মর্মস্পর্শীভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকজন মুসলমান লেখকের রচনায় মধ্য প্রাচ্যের গল্প স্থান পেয়েছে এবং তার ফলে

রোমান্স আখ্যায়িকা ও উপন্যাসের বিকাশ দেখা যায়। নাট্যরচনার ইতিহাসে যাত্রাগান, পাঁচালী, তর্জা ও কবিগান ইত্যাদির মূল্য অসাধারণ। কবিগানে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন দু জন— ভোলা ময়রা আর এক পোর্তুগীজ্ সাহেব 'অ্যান্টনি ফিরিংগি'।

আধুনিক যুগের সাহিত্য প্রেরণা পেয়েছে ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য ভাব ও সাহিত্য থেকে। বাংলার নব জাগৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সাহিত্য আর আধুনিক যুগের প্রধান সৃষ্টি হচ্ছে গদ্য সাহিত্য। মধ্য যুগের গদ্যের অবস্থা শোচনীয় ছিল, কিন্তু ইংরেজীশিক্ষিত লেখকেরা মিশনারী সাহেবদের সহায়তায় ও মুদ্রাযন্ত্রের মারফত সংবাদপত্র ও অন্যান্য গদ্যরচনার পথ খুললেন। সেই পথেই আজ বাংলার গদ্য পুষ্টি লাভ করে এগিয়ে চলেছে।

আধুনিক যুগের প্রথম থেকেই একটা পরিবর্তন দেখা গেল— সাহিত্যে ধর্মের জায়গায় মানবজীবন ও সামাজিক চেতনার আবির্ভাব। এই খাতেই আধুনিক সাহিত্যের প্রগতি চলেছে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য পরিপাক করবার চেষ্টা করল একসঙ্গে ইংরেজী রোমান্টিক ভাবধারা, পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞান। তার ফলে গদ্যে ও কাব্যে এক বিস্ময়কর নব জাগরণ দেখা দিল। এই জাগৃতি মধ্য যুগের ধারাকে মূলত অস্বীকার করেই ঘটেছিল, যদিও লেখকদের মন ছিল ভারতীয় ও বাঙালী সংস্কৃতিতেই গড়া। ভাববিরোধ ও ভাবসমন্বয়ের মধ্য দিয়েই এই সাহিত্যিক জাগরণ সম্ভব হল।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই আরব্ধ হল সাহিত্যিক যুগান্তর। গদ্য রচনার দিকেই নজর বেশি : রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় ধীরে ধীরে গদ্যরীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় দেখি পুরানো কাব্যরীতির সঙ্গে মিশেছে তৎকালীন সমাজচেতনা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই খাঁটি আধুনিক যুগের আরম্ভ

হল—মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। গদ্যে, পদ্যে ও নাটকে যুগান্তর এল এবং পাশ্চাত্ত্য ভাব ও রীতিকে পরিপাক করে সাহিত্যিকরা একটি বিরাট সংস্কৃতির সৃষ্টি করলেন। মধুসূদন ও বঙ্কিম ছাড়াও এ যুগে প্রতিভাবান লেখকের অভাব ছিল না—দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র ইত্যাদি। এই যুগের সাময়িক সাহিত্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই সাহিত্যের এই বিরাট সাধনা হল অপরিমেয় ভবিষ্যতের দৃঢ় ভিত্তি।

বিশ শতকের প্রথম থেকেই শুরু হল রবীন্দ্রযুগ। অসংখ্য লেখকদের সাধনায় সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে বিবিধ রচনা ও নতুন নতুন রীতির পরীক্ষার ফলে বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে। উনিশ শতক থেকেই মহিলা কবিদের রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল; বর্তমানেও লেখিকার সংখ্যা প্রচুর। বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রনাথ। একটি জাতির রুচি, সংস্কৃতি ও মানসচর্চার বিশিষ্ট ধারাই সৃষ্টি ও গঠন করেছেন তিনি। সাহিত্য, সঙ্গীত, কলাশিল্প, শিক্ষা, জাতীয়তাবোধ, সমাজচেতনা, ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবন, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সূচনা—সব দিক দিয়ে এমন মৌলিক ও বহুমুখী প্রতিভা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় মেলে বলে মনে হয় না।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে অন্য একটি ধারার নির্দেশ রয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের খাতে চিরকাল চলা যায় না, চলা উচিতও নয়। তাই তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ করে ১৯৩০-এর পর থেকে নব সামাজিক চেতনা ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে নতুন ধরনের বাংলা সাহিত্য। এ সাহিত্য সব সময়ে উচ্চস্তরের না হলেও অগ্রগতির প্রেরণায় ও বৈচিত্র্যে এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

গত এক শো বছরের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি মূল সূত্র সহজেই নজরে পড়ে। প্রথমত, এই সাহিত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি। ফলে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ছাপ এখানে স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, এই সাহিত্য শিক্ষিত ও বিদগ্ধ জনের উদ্দেশ্যে রচিত ও উৎসর্গিত। আধুনিক যুগে খাঁটি লোকসাহিত্য রচিত হয়নি। তৃতীয়ত, এই সাহিত্যে সমাজচেতনা অত্যন্ত প্রবল। সনাতন ধারা থেকে বিচ্যুতির লক্ষণ খুবই স্পষ্ট। চতুর্থত, এর উপাদান ও আঙ্গিক ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ঋণী। পঞ্চমত, এই এক শো বছরের সাহিত্যপ্রতিভা মূলত রোমান্টিক। পরিশেষে বলা যায় যে, খাঁটি লোকসাহিত্য রচিত না হলেও বর্তমান সাহিত্যের দ্রুতবর্ধমান গণচেতনা প্রাচীন ও নবীন রূপ এবং আঙ্গিকের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালী মানসক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে।

৭

ভবিষ্যৎ

এক

আর্যাবর্ত আর উত্তরাপথ, দাক্ষিণাত্য আর পশ্চিম ভারত—এই গণ্ডীর ভিতরেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘুরে গেছে প্রাচীন ইতিহাসের অগ্নিচক্র। কিন্তু অন্ধকারে ঢাকা পূর্ব ভারতে ও বাংলায় দিনে দিনে, তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়েছে অলক্ষ্য ঐতিহাসিক শক্তি। এই রহস্যময় তমসাচ্ছন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা বাঙালী। ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে বার বার মেঘ জমেছে; বিদেশী অভিযানের ঝড় এসে থেমে গেছে উন্নাসিক আর্যের অস্পৃশ্য বাংলার দ্বারে। নেহরুও তাই 'ভারত-আবিষ্কার' গ্রন্থে উত্তর প্রদেশ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন: 'আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ—হিন্দুস্থানের হৃদয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতার কেন্দ্র, ভারতের প্রতীক।'

আঠারো শতকের শেষার্ধে হল পটপরিবর্তন: নতুন ঐতিহাসিক শক্তির আবির্ভাব ঘটল। এবার উত্তর-পশ্চিমে নয়, পূর্ব ভারতে ও বাংলায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আধুনিক ভারত জন্ম নিল বাংলা দেশে: বদলে গেল ইতিহাসের ছন্দ। কিন্তু নতুন সভ্যতার আভাস এসেছে অজস্র গ্লানির ভিতর দিয়ে, আর সেই গ্লানিতে আজ বাঙালী অবসন্ন।

হাহাকার উঠেছে যে, বাঙালী ধ্বংসোন্মুখ—বিশেষত বাঙালী হিন্দু। ধ্বংসের লক্ষণ দেখা গেছে তার আর্থিক দুরবস্থায়, তার অর্থনৈতিক পরাজয়ে, তার স্বাস্থ্যের অবনতিতে, তার রাষ্ট্রীয় জীবনের জটিলতায়, তার সমাজব্যবস্থায়।

কিন্তু চিন্তাশক্তি ও মনীষার অভাব নেই বাঙালীর। আজ চরম পরীক্ষার দিনে তাকে নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে। চাই খাঁটি আদর্শবাদ, চাই দুর্বার সংগঠনপ্রতিভা। সমূহ সর্বনাশকে প্রতিরোধ করে নব

জীবনের খাতে ঘুরিয়ে দিতে হবে সমাজশক্তিকে। দেখতে হবে সমাজের সব স্তরেই যেন আদর্শবাদ ছড়িয়ে পড়ে, সব স্তরেই যেন সাড়া পড়ে যায়। পরিণত সমাজচেতনা চাই; হাজারে একজনের স্বাচ্ছন্দ্য জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। বিরোধ ও অবিচার, কুৎসিত সংস্কার ও উচ্ছৃঙ্খলতা জাতিকে দুর্বল করে অবশেষে অপমৃত্যু আনে। আত্মঘাতী সমাজের পরিসমাপ্তি আনতেই হবে।

চাষীকে বাঁচাতে হবে, মজুরকে বাঁচাতে হবে। দেশের হাজার হাজার লোক যে তিলে তিলে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে একটা নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থার ফলে এ কথা যদি আজ আমরা না বুঝি তাহলে ভবিষ্যৎ কাল এর চরম প্রতিশোধ নেবে এক অভাবনীয় ধ্বংসের দ্বারা। তথাকথিত মধ্যবিত্ত আজ আর মধ্যবিত্ত নেই, নেমে চলেছে দুর্বার গতিতে :

বিধাতার রুদ্র রোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান;

সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ,
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

—রবীন্দ্রনাথ

বেল্‌শাজারের জীবনে দেয়ালের গায়ে লেখা শুরু হয়েছে। চার দিক ঘিরে চলেছে ওঠা-পড়ার বিপুল ঐতিহাসিক আয়োজন। শ্রেণী-দম্ভ ও শ্রেণীসংঘর্ষ ছেড়ে আজ বাঙালীকে সংঘবদ্ধ চেষ্টায় নতুন সমাজ গড়তেই হবে। মানুষের প্রগতিশীল মন ও জীবন পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তন করে। এইভাবেই ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচিত হয়।

বাঙালীর জীবনে বিপর্যয় যে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ

নেই। তাই আজ প্রাচীন এথেনীয়দের সঙ্গে তুলনা চলেছে। সংস্কৃতিবাহী বাঙালী জাতি কি ব্যাধিপ্রপীড়িত হয়ে সামাজিক দুর্বলতার প্রহরে অনুন্নত বর্বর শ্রেণীর আঘাতে এথেনীয়দের মতোই লুপ্ত হয়ে যাবে? এই আতঙ্কের কি কোনো ভিত্তি আছে।

দুই

যুগে যুগে বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঐতিহাসিক বিপ্লব বাঙালীকে ধ্বংস করতে পারেনি। সাময়িক অধোগতি সত্ত্বেও চিন্তাধারায় ও নতুনকে গ্রহণ করার শক্তিতে বাঙালী আজো তো প্রাণধর্মের লক্ষণ দেখিয়ে চলেছে। পূর্বে ও পশ্চিমে নব জাগৃতির ইশারা তো মিলছে গণচেতনার আভাসে। অতীতে এবং অদূর অতীতেই এক শো দেড় শো বছরের মধ্যেই বাংলা অন্তত দেড় শো মনীষীর জন্ম দিয়েছে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এ সবই তো প্রাণবন্ত জাতির লক্ষণ।

তাহলে কি অবনতি হয়নি, অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নেই? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, অবনতি সাময়িক মাত্র এবং এই অবনতি ও তার সঙ্গে একটি তীব্র সচেতন মন বাঙালীকে নিয়ে চলেছে নব যুগের উদয়াচলের পথে। এ বিপর্যয় অপমৃত্যু নয়, এ শুধু এক অপরিমেয় দিগন্তের পূর্বাভাস। রবীন্দ্রনাথ পরিত্রাণকর্তার কথা বলেছেন, মহামানবকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু মহামানব বা পরিত্রাণকর্তা আসবেন কি-না জানি না; তবে বুদ্ধি, অনুভূতি ও কল্পনা দিয়ে বুঝি যে পরিত্রাণ আসবেই। এ যুগ নেতার যুগ নয়, কর্মীর যুগ। তাই হয়তো সাধারণ অর্থে কোনো বিশিষ্ট নেতা নেই বাংলায়। কিন্তু বহু অখ্যাত, অজ্ঞাত লোক গভীর আদর্শবাদ নিয়ে তিলে তিলে নিঃস্বার্থভাবে খেটে চলেছে তলায় তলায়।

তাদের সাধনার যৌথ শক্তি নিশ্চয় একদিন আসমুদ্রহিমাচল বাংলাকে সমূলে পরিবর্তন করে দেবে। সংকটের চরম প্রহরে নেতৃত্ব আপনিই আসে।

এক একটা যুগে এক একটা দেশের ওপর আসে ঐতিহাসিক দায়িত্বের ভার। আজ হয়তো সেই দায়িত্ব এসেছে সারা প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিসমূহের ওপর, ভারতে ও বাংলায়। ইংরেজী আমলের বাংলা ভারতকে এক পথ দেখিয়েছিল ; আজ নতুন পথের প্রারম্ভেও বিংশ শতাব্দীর বাঙালী হোক অগ্রগামী। সেদিন ছিল ভারতের দায়িত্ব তার ওপর। আজ সর্বহারা হয়ে সে হয়তো হতে চলেছে এক নতুন পৃথিবীর দায়িত্বের অংশীদার। এথেনীয়রা নতুনকে অস্বীকার করেছিল ; তাই তারা মরে গেছে ; বাঙালী নতুনকে গ্রহণ করে বেঁচে থাকবে।

বাঙালীত্ব মানে সারা পৃথিবীকে অস্বীকার করে কূয়ো খুঁড়ে তার মধ্যে ব্যাঙ হয়ে বসে থাকা নয়, রক্ত ও ঐতিহ্যের মূল ধারা বজায় রেখে নিঃশঙ্ক মনে কালোপযোগী পরিবর্তনের পথে অগ্রগতি। গোষ্ঠীসর্বস্ব সমাজ আন্তর্জাতিকতার দিকে চলেছে। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এমন কি অন্ধ জাতীয়তাও তাই হবে যুগধর্মবিরোধী। স্বাতন্ত্র্য থাকবে, বৈচিত্র্য থাকবে। কিন্তু তা যেন সমন্বয়বিরোধী না হয় ; স্বার্থ যেন সুবুদ্ধিকে গ্রাস না করে।

আগামী পরিবর্তনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যে সমাজের কাছে আমরা পেয়েছি অমানুষিক অপমান আর অত্যাচার তার দিন শেষ হবেই।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিবাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ. তুমি কি বেসেছ ভালো ?
—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের সমাজব্যবস্থা যে নিঃস্ব, রিক্ত, জীর্ণ ও মুমূর্ষু তার স্বীকৃতি মেলে চাষী-মজুরের অশিক্ষা আর শোচনীয় দারিদ্র্যে, মধ্যবিত্তের কুশিক্ষা আর নৈরাশ্যে, ধনিকের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে। খণ্ডিত বঙ্গ, যুক্ত ও বৃহৎ বঙ্গ—এ সবেরই ঐতিহাসিক কারণ ও অর্থ রয়েছে ; কিন্তু যুগব্যাপী প্রশ্নের উত্তর এদের কোনোটাতেই মিলবে না। বহু পুরাতন ইমারতে ঘুণ ধরেছে ; ধ্বসে পড়ছে ; চুনকাম-করা কবরের নিচে হাড়। মানুষের নীড়সম্ভোগী মন ধীরে ধীরে শবসম্ভোগী সমাজের সৃষ্টি করে, পরিবর্তনকে ভয় পায় ; কিন্তু প্রতিক্রিয়ার আঘাতে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসেই। সভ্যতার নির্মোক, সাপের খোলস বদলাবার দিন আসেই। ফিনিক্‌স্ পাখী নিজেরই চিতাভস্মে নব কলেবর ধারণ করে।

।৩ন

সর্বনাশের প্রহরেই জাতির গভীরতম আধ্যাত্মিক শক্তির জাগরণ হয় ; নতুন পন্থা খুঁজে ফেরে মানুষের চিন্তিত, আলোড়িত সমাজ-বুদ্ধি। জাতির জীবনীশক্তির উৎস এখানেই। ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ্ বলেছেন : 'By the soul only nations shall be great'—সেই আত্মার শক্তি, সেই ধর্ম হিন্দু নয়, ইসলাম নয়, সনাতন মানবধর্ম। আর এই মানবধর্মই হচ্ছে আজ সারা পৃথিবীর যুগধর্ম। খাঁটি বাঙালীত্ব এই কালধর্মের বিরোধী নয়। তাহলে কিসের ভয় ? বাঙালীর

ভয়, বাঙালীর বিপদ সেই দিন আসবে যেদিন সে তার সনাতন মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে।

সাত কোটি লোকের মানসিক অখণ্ডতার শক্তি সাময়িক বিপর্যয়ে ব্যর্থ ও নির্মূল হয়ে যায় না, পথের সন্ধান মেলেই। শুধু মানুষের অপরাজেয় মনে বিশ্বাস রাখো। খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বাঙালীকে হতে হবে নতুন সভ্যতার অগ্রদূত : ছিন্ন সতীদেহ যেখানে যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানেই জেগে উঠেছে পীঠস্থান। আদর্শবাদের দৃঢ়তা নিয়ে বাঙালী যদি নিঃশেষও হয়ে যায় তাহলে তার প্রতিটি রক্তবিন্দু নতুন মানুষ, নতুন জাতির মধ্যে আবার জীবন পাবে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের বাণী :

> মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

তৃতীয় পর্ব

পরিশিষ্ট

১

বিশ বছর

এক

স্বাধীনতার পর বিশ বছর। এ সূর্য-সূচনা কেমন? কী হল বিশ বছরে? নয়া দিল্লির বার্তা ও ইঙ্গিত ছড়িয়ে গেল কি ভারতের গ্রাম থেকে গ্রামান্তে? অনেকগুলো বছরের গ্লানি ও অপমান, অনেক দুঃখ আর অপরিমেয় অত্যাচার, বহু দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকারে ভরা ইতিহাসে এল বড়ো কষ্টের এই স্বাধীনতা। শুকনো হাড় আর মড়ার খুলির বোঝা পিছনে রেখে এগিয়ে এল স্বাধীনতার রথচক্র। সামনে অনবসর ভবিষ্যৎ।

প্রথমেই কয়েকটা কথা বলা দরকার। কথাগুলো আর কিছু নয়, শুধু অতীতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ। অতীত মরে না, দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে বর্তমানের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ রচনা করে চলে। এটা কবিত্ব নয়, খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য; ইতিহাসের নৈতিক শক্তি কার্য-কারণের ধারাচক্র। যুগে যুগে ভারতের মানচিত্র বদলে চলেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ আর গৃহবিবাদের সঙ্গে। যে অখণ্ড ভারতের কথা বলতে গিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি সেই ভারত খণ্ডিত হয়েছে অনেক বার অনেক রকমে। প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে দূরত্বের দুঃখ আর প্রকৃতির বাধা একেবারে দূর করা সম্ভব হয়নি। তাই নানা কারণে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা ও আচার-বিচার নিয়ে ভারতের জীবন হয়েছে অত্যন্ত জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল। স্বাধীনতার বিশ বছর এ কথার সত্যতা আমরা দিনে দিনে বুঝেছি। তবু বহু শতাব্দীর জলবায়ু আর বহু পুরাতন মাটি একটি ভারতীয় মন গড়ে তুলেছে সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে। সে-মন জনসাধারণের মন, তাদেরই জীবনভঙ্গী। উচ্চ স্তরের জীব যাঁরা তাঁদের দেশপ্রেম অনেকটা স্বার্থের বস্তু, খানিকটা বুদ্ধির, বাকিটা হয়তো দম্ভের। কিন্তু নীরব গণসমাজ মাটিকে ভালোবেসেছে, ভালোবেসেছে দেশের

জল, আলো, হাওয়া, দেহে ও মনে ছয়টি ঋতুর অফুরন্ত পটপরিবর্তন। এই মাটির পৃথিবী আজও তাদের কাছে একটি অপরূপ বিস্ময়। দেশের বিপদে তারাই মার খেয়েছে বেশি, বন্যা আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর মহাযুদ্ধে তারাই গুঁড়িয়ে গেছে। মন্বন্তরের এই অভিশপ্ত সন্তানেরা ইতিহাসে স্থান পায়নি। বিশ বছরের স্বাধীনতা কি তাদের পরিচয় দিয়েছে ?

দুই

ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তার কল্পনা ভারতের ইতিহাসে প্রায় মেলেই না। পরাধীনতার ঐতিহাসিক কারণ ও প্রয়োজন তাই আমাদের ঘটেছিল। নিজের সুবিধার জন্যই বিদেশী বণিক-সমাজের ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা। ফল হল বিপরীত, এল জাতীয় চেতনা। একেই বলে ইতিহাসের বিদ্রূপ। উনিশ শতকের শেষভাগে এল নবযুগের সম্ভাবনা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি মহাযুদ্ধের মর্মান্তিক অশান্তি ও অসন্তোষ। এই নবচেতনার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আমাদের এই বড়ো দুঃখের স্বাধীনতা। ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের স্বদেশ ; ইংরেজের স্বদেশ 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে'। এখানকার সুখদুঃখের অংশীদার ওরা হয়নি ; ভারতের সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্ক নেই ওদের, ছিল শুধু শোষণের। ওদের আমলে অত্যাচার ও লুণ্ঠন আর ধ্বংসের একটা ঝড় বয়ে গেছে, এমন নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে যে আমরা খণ্ডিত ভারতে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেছি। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ও ভাগ্য নিয়ে নিষ্ঠুর জুয়ার খেলায় স্বার্থান্বেষী কুচক্রীরা করেছে এই দেশ-বিভাগ। ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসৃষ্টি প্রগতির লক্ষণ নয়, মধ্যযুগের ধর্মোন্মাদ, ইতিহাসের পশ্চাদপসরণ। হয়তো সব অসুখেরই ওষুধ হল সময়, হয়তো ইতিহাসের কাঠগড়ায় ভাবী কালের বিচারে দেশী-বিদেশী অনেক প্রভুই হবেন আসামী। ইংরেজ

ভারত দখল করেছিল ছলে-বলে-কৌশলে। আমাদের স্বাধীনতাও যেন ছলনা না হয়। কিন্তু অতীতের মুক্তি-সৈনিকেরা খণ্ডিত ভারতের মুক্তি চায়নি। তারা মরেছে, আর কোলাহল চালিয়েছে শবসম্ভোগী শকুনের পাল। বিশ বছরের স্বাধীনতায় ভারত আর পাকিস্তান আরো দূরে সরে গেছে। বিদেশী চক্রান্ত কি সফল হবে?

নানা কারণে ইংরেজের পক্ষে ভারতকে সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক দখলে রাখা সম্ভব ছিল না : তাই স্বাধীনতা। ভারতকে আর্থিক ও রাজনৈতিক হিসাবে প্রাচ্যশক্তি হতে দেওয়া ইংরেজের স্বার্থবিরোধী : তাই বিভাগ। আর তাই স্বাধীনতার বিশ বছরের অনেকটাই কেটেছে এই বিভাগেরই জের টেনে।

কয়েকটা বিষয়ে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ভারতের গেরুয়া রঙের মাটি সকলকেই কেমন যেন বৈরাগী করে রেখেছে; কোনো কিছুই সহজে আমাদের স্থবির মনকে নাড়া দিয়ে সচল করতে পারে না। কাশীতে গ্রহণের উৎসবে বিরাট হিন্দু জনতা দেখে হাক্‌সলি লিখেছিলেন যে, এতগুলো লোক পারলৌকিক চিন্তা একটু কমিয়ে দেশের দিকে তাকালেই ভারত স্বাধীন হয়ে যেত। মুসলমানদেরও একই অবস্থা, ধর্মের জটিলতায় সামাজিক জীবন হয়েছে পঙ্গু। পরিবর্তন ঘটেনি ধনীদরিদ্রের শ্রেণীগত স্বার্থবিরোধে। স্বাধীন ভারতে ধর্মঘটের অভাব হয়নি; ধীরে ধীরে দুটি শ্রেণী দূরে সরে চলেছে। হয়তো এই ধনীদরিদ্রের বিবাদের মধ্যেই আগামী ইতিহাসের বীজ লুকিয়ে আছে। যে স্বাধীনতা সারা দেশের কাম্য হওয়া উচিত ছিল, যে স্বাধীনতায় নবজন্মের সম্ভাবনা ছিল, তার অংশীদার হতে পারেনি জনসাধারণ। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো গেছে কিপ্‌লিঙের সেই 'শ্বেত মানবের দায়', গেছে হয়তো 'পাম্‌-পাইনের রাজত্ব', কিন্তু কোথায় জনরাজ, কোথায় গণতন্ত্র? 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' গাইবে কি প্রেতমূর্তি কঙ্কালের দল? অনেক দিন দাসত্বের পরে স্বাধীনতা মিলেছে। তাই সমস্যার আর অন্ত নেই। অবশ্য দুঃখভোগ না

করে মুক্তি অর্জন করা যায় না ; কড়ায়-গণ্ডায় ইতিহাস দাম আদায় করে নেয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর ? একতার অভাব, সহানুভূতি নেই, সংগঠন নেই, নেই খাঁটি আদর্শবাদ। স্বাধীনতা পাওয়া আর স্বাধীনতার উপযুক্ত হয়ে বেঁচে থাকা এক কথা নয়। অনেক রকমেই আমাদের নৈতিক অবনতি হয়েছে।

তিন

স্বাধীনতার স্বরূপ কী ? শুধু কি বিদেশী জুলুম আর শোষণের হাত থেকে মুক্তি ? এ যদি স্বাধীনতা হয় তাহলে তার মূল্য খুব বেশী নয়। যে রাজনৈতিক আদর্শ দাসত্বের দিনে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল তার সঙ্গে চামড়ার রঙের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। আমাদের স্বাধীনতার দলিলের প্রথম কথাই হচ্ছে এমন এক খাঁটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যেখানে শ্রেণীগত পার্থক্য নেই, নেই অত্যাচার ও শোষণের সম্ভাবনা ; যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে দেশের সমষ্টিগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল প্রতিজ্ঞা। বিশ বছরের স্বাধীনতায় কেউ আশা করতে পারে না যে, একটা বৃহৎ সমস্যাবহুল দেশে হঠাৎ স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে। কিন্তু পথের শেষে এসে না পৌঁছলেও পথের আরম্ভ তো হবেই ? আমরা কি ঠিক পথে চলেছি ? প্রতি বছরের শেষে এই প্রশ্নই আমাদের সকলের মনে এসেছে। সে প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই আসা উচিত ; না এলে স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না। বছরের পর বছর চক্রের আবর্তনে স্বাধীনতা দিবস ফিরে আসবে। কিন্তু ব্রত পালন ও উদ্‌যাপন হবে কি ?

মানুষ ভবিষ্যৎ জানতে পারে না ; ঊর্ধ্ব আকাশ মৌন, নিরুত্তর। ঐতিহাসিক জাগরণ ভারতকে ও বাংলাকে কোন পথে নিয়ে যাবে ? ভারত ও বাংলা যদি ক্যাসানড্রা হত, তাহলে হয়তো গ্রীক্ নাটকের ভাষায় বলে উঠত :

'এ কোন অজানা পথে নিয়ে এলে, অ্যাপোলো আমার !'

চার

'হের বৎস, সম্মুখেতে তব প্রসারিত ভারতের মানচিত্রখানি।' আমরা ছেলেবেলায় যখন এই কথা শুনেছি তখন দেহ-মনে একটা তীব্র শিহরণ অনুভব করেছি; কল্পনা ও স্বপ্ন যেন শিখায়িত হয়ে উঠেছে। এই বিরাট দেশ আমাদের, পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিগুলির মধ্যে আমাদের নাম সামনের পঙক্তিতে, কতো প্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের, কতো জাতির সমন্বয়। গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোগল, আরো কতো জাতি এসে মিশে গেল এই বিশাল ভারতে। আর্য, দ্রাবিড়, মোঙ্গল, আরো কতো রক্ত মিশে গেল আমাদের দেহে। সভ্যতা ও সাধনার কী অপরূপ লীলাক্ষেত্র আমাদের দেশ! উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথের ধুলোয় ছোট শিশুর মুখে নেহরু দেখেছেন প্রাচীন গ্রীকের ভাস্কর্য। মধ্যপ্রাচ্যের গোলাপ, দূরপ্রাচ্যের লীলায়িত শ্যামলতা, এশিয়ার নীল নির্জন সমুদ্রের আভাস ভারতবর্ষে। ভূগোলে পড়েছি আমাদের দেশ প্রায় একটি মহাদেশ, পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু আমাদের পরে যারা এসেছে ও আসবে তাদের কাছে কী মানচিত্র আমরা দেখাব! বলব: 'দেখ, এই আমাদের কৃতিত্ব। মানচিত্রের পূর্ব ও পশ্চিম কোণে ঐ যে অন্য রঙের দু টুকরো জায়গা রয়েছে ঐখানে ভারতের শেষ, পাকিস্তানের আরম্ভ। হিন্দু ও মুসলমান নামে দুটি জাতি আছে; ঐ দুটি জায়গা তাদেরই স্বদেশ। এক কালে এরা একই ছিল, একসঙ্গে সুখ-দুঃখে অংশ নিয়েছে, একই প্রভুর কাছে গোলামি করেছে। কিন্তু একদিন এরা হঠাৎ আবিষ্কার করল যে এরা এক নয়, এরা আলাদা; এরা আবিষ্কার করল যে

স্বাধীনতা পেতে হলে একসঙ্গে থাকা চলে না, আলাদা হয়ে যেতে হয়।'

ভাইয়ে-ভাইয়ে যখন বনে না তখন একান্নবর্তী পরিবার অচল হয়ে পড়ে। আলাদা হয়ে তারা সুখে-দুঃখে দিন কাটায়। কিন্তু দেশ ভাগ করে আলাদা হয়ে গিয়েও তো আমরা সুখী হইনি, সন্তুষ্ট হইনি। পরস্পর সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়েছি, পরস্পর সম্পর্ক দিনে দিনে তিক্ত করে তুলছি। আগে দাঙ্গা করেছি, এখন সর্বদাই 'যুদ্ধং দেহি' ভাব! তাহলে আলাদা হলাম কোথায়? আর আলাদা হয়ে লাভ হল কী?

তবু মানুষ বর্তমানের দুঃখ ভোলে ভবিষ্যতের আশায়। কালো রাতের কিনারে ফোটে ঊষার গোলাপ। যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিচক্রে সৃষ্টি করে কালের স্রোতে মিলিয়ে গেছে এমন ক্ষুদ্র লোকের কাহিনী ভারতের ও বাংলার ইতিহাসে ভিড় করে আছে। কিন্তু ভাগ্য ও প্রকৃতি যে ঐক্য অভিলাষ করেছে সময়ের বিরাট মিছিলে তার ব্যাঘাত ঘটেনি। অনেক রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ঘৃণায় কখনো স্থায়ী সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। ভারতের ও বাংলার নিস্তব্ধ মানচিত্র যুগে যুগে সব পরিবর্তন সহ্য করেও নিজস্ব অখণ্ডতা রক্ষা করে চলেছে।

পাঁচ

বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানের বাংলাভাষী অঞ্চলের আয়তন এক লক্ষ বর্গমাইলের কম নয়, লোকসংখ্যাও প্রায় দশ কোটি। এই বৃহৎ জনসমষ্টির বাঙালীত্ব সম্বন্ধে চেতনা গত বিশ বছরে পূর্ব ভারতে এবং পূর্ব পাকিস্তানে সমভাবে এবং তীব্রভাবে বেড়ে গেছে। এর প্রধান কারণ দুটি রাষ্ট্রেরই কেন্দ্রীয় শক্তি বাংলা এবং বাঙালী সম্বন্ধে বিরোধীভাবাপন্ন। দুটি রাষ্ট্রেই বাংলা হয়েছে শোষিত বিশ বছরে; দুটি রাষ্ট্রেই বাঙালীর উন্নতির জন্য কেন্দ্র থেকে মনোযোগ মেলেনি।

বাঙালীত্ব সম্বন্ধে এই চেতনা শুধু বাঙালীর জীবনে নয় দুটি রাষ্ট্রেরই জীবনে প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে, বিশেষত অশুভ শক্তিরূপে অমঙ্গলেরই সূচনা করে।

গত বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক ধারা হচ্ছে কংগ্রেসের অবনতি ও পতন। এর জন্য প্রধানত দায়ী কেন্দ্রের সমগ্র শাসননীতি : এই নীতিতে বাংলার প্রতি কোনো সদিচ্ছা প্রতিফলিত হয়নি। এর ফলে একটি মারাত্মক অক্ষম আক্রোশ সমগ্র বাঙালী জীবনকে অধিকার করে ভারতের ইতিহাসে সমূহ সর্বনাশের পত্তন করে চলেছে। অকংগ্রেসী জাতীয় দল ও বামপন্থী দল মিলিত হয়ে যে যুক্তশক্তি সরকার গঠন করে ১৯৬৭ সালে তার ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য ; আবার সেই যুক্তশক্তি সরকারের পতনও তেমনি এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা।

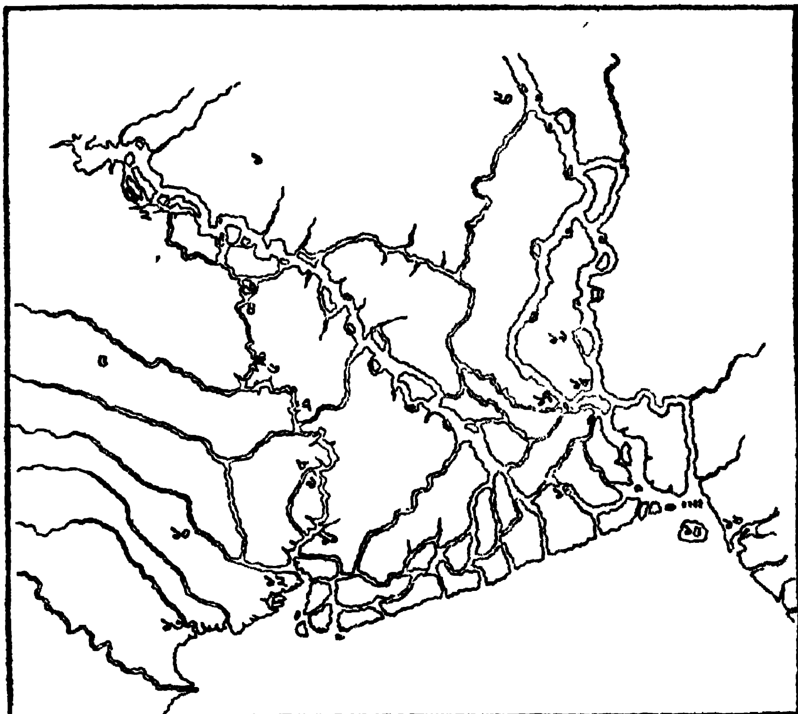
চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতীয় সামরিক শক্তির সাফল্যের পরিচয় মেলেনি কিন্তু আর্থিক দৈন্য বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বন্যা-বিধ্বস্ত উত্তর বঙ্গকে গড়ে তুলতে হবে। কলকাতার দুরবস্থা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফরাক্কা আর এক সমস্যা। শুধু বৃত্তিহীন শিক্ষিত জনসমষ্টির চাপেই সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়ছে। কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলোরই পূরণের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং বাংলায় শিল্পে, বাণিজ্যে এবং জীবিকার বিভিন্ন স্তরে অবাঙালীর প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা হয়েছে। এই খণ্ডিত বাংলা থেকেই সংগৃহীত হয় ভারত সরকারের রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ। অথচ বাংলার উন্নয়নের জন্য অর্থ কেন্দ্র থেকে মেলেনা।

গত বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অজস্র লোক এসে গেছে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু উদ্‌বাস্তু সমস্যার সমাধানের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। রাজনীতির দাবাখেলায় ও অসামাজিক কর্মের সর্বক্ষেত্রেই এই উদ্‌বাস্তুরাই কিন্তু সবচেয়ে কূট ও জটিল চাল।

সন্দেহ নেই যে, পূর্বে বা পশ্চিমে দ্রুতবর্ধমান গণজাগরণই হচ্ছে গত বিশ বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু এই গণশক্তি সংযত নয়, সংহত নয়; এই গণশক্তি বিভ্রান্ত ও মোহাচ্ছন্ন; এর জাগরণ সুপরিকল্পিত নয়, সুপরিচালিত নয়।

পূর্বে ও পশ্চিমে আত্মরক্ষার পথে বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে রাজনীতি, জীবিকা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংগ্রাম করে চলেছে। এই দিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসল-মানের অবদানের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ—বিশেষত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রক্ষায় ও বর্ধনে। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নবধারার আবির্ভাব খুবই স্পষ্ট। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাট্য-আন্দোলন ও অভিনয়ের ব্যাপক প্রয়োগ বিভিন্ন রীতির মাধ্যমে।

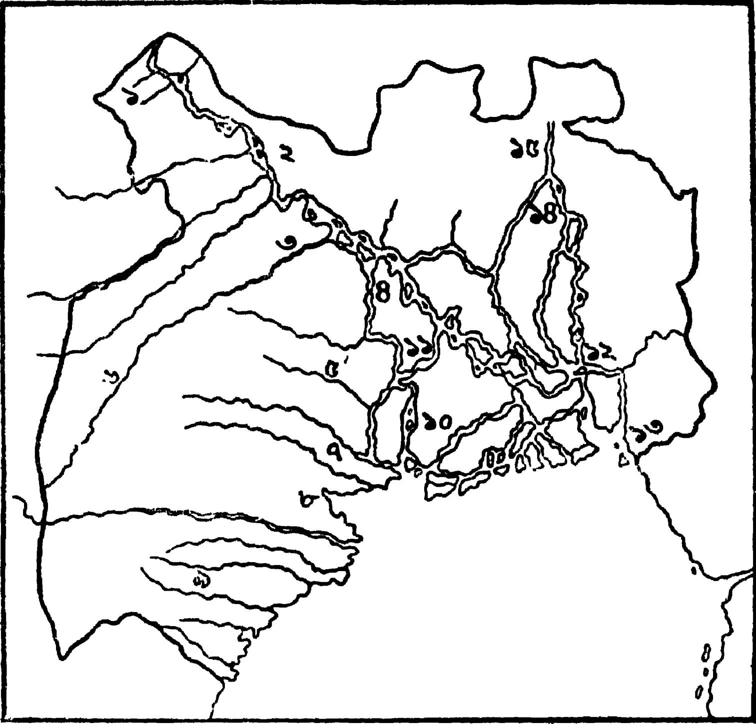
বাংলা : ১৬৬০



মোগল সম্রাট আওরংজেবের রাজত্বকালে যখন বাংলা দেশ মীর জুমলার শাসনাধীন ছিল তখন ১৬৬০ সালে এই মানচিত্র আঁকেন ভ্যান্ ডেন্ ব্রুক্। এই মানচিত্রে নদীর গতি ও অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বাংলা দেশের আয়তন ও সীমানা বোঝাবার জন্য কুড়িটি স্থানের নাম করা হয়েছে :

১ মালদহ ২ রাজমহল ৩ মুর্শিদাবাদ ৪ কাশিমবাজার
৫ বক্রেশ্বর ৬ পলাশী ৭ নদীয়া ৮ সাতগাঁ ৯ হুগলী
১০ মেদিনীপুর ১১ কলকাতা ১২ তমলুক ১৩ বালেশ্বর
১৪ বাকলা ১৫ সন্দীপ ১৬ চট্টগ্রাম ১৭ ঢাকা
১৮ সোনার গাঁ ১৯ শ্রীহট্ট ২০ বারিতলা

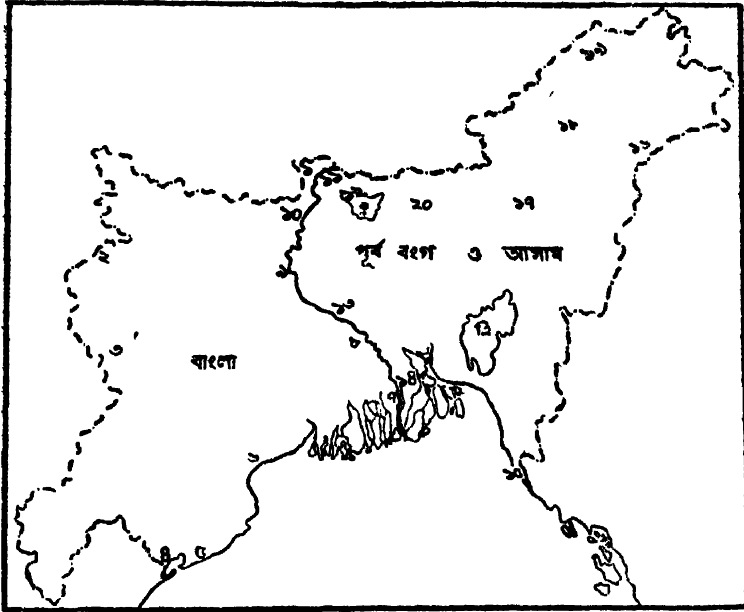
বাংলা : ১৭৩০



মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা। মহম্মদ শাহ নামেই সম্রাট; শক্তি নেই। বাংলা দেশ তখন সুজাউদ্দীনের শাসনাধীন। ১৭৩০ সালে এই মানচিত্র আঁকেন আইজ্যাক্ টিরিয়ান্। ১৬৬০এর মানচিত্রের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায় যে নদীর গাত বদলে গেছে। সীমানার পার্থক্যও বেশ স্পষ্ট। পনেরোটি স্থানের নাম দিয়ে আয়তন বোঝানো হচ্ছে।

১ পাটনা ২ মুঙ্গের ৩ রাজমহল ৪ কাশিমবাজার
৫ বর্ধমান ৬ জৌনপুর ৭ মেদিনীপুর ৮ বালেশ্বর
৯ কটক ১০ হুগলী ১১ নদীয়া ১২ ঢাকা ১৩ চট্টগ্রাম
১৪ ঘোড়াঘাট ১৫ পটন

বাংলা : ১৯০৫



ইংরেজী আমল : জাতীয়তা আন্দোলনের যুগ। বাংলা দেশকে ভাগ করলেন লর্ড কার্জন ; বুঝলেন জাতীয়তাবাদকে রোধ করতে না পারলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান হবে। তিনি দেখলেন আন্দোলনের চালক হয়েছে বাঙালী হিন্দু। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে সমগ্র পূর্ব ভারতকে তিনি এমনভাবে দুটি প্রদেশে ভাগ করলেন যে দুই প্রদেশেই বাঙালী হিন্দু হয়ে গেল সংখ্যায় দুর্বল। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল না। আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে উঠল। সংক্রামক ব্যাধির মতো জাতীয়তাবাদ সমগ্র পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যত্রও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে লাগল।

মানচিত্রে দুটি প্রদেশেরই অবস্থান দেখানো হচ্ছে। পশ্চিমে ১৩টি জেলা, পূর্বে ১৫টি। সারা ভারতে তখন বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ কোটি।

সীমানা : (ক) বিহার-ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা-পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে

নতুন 'বাংলা': ১ দার্জিলিং ২ বক্‌সার ৩ পালামৌ ৪ ভানপুর ৫ পুরী ৬ বালেশ্বর ৭ মোরেলগঞ্জ ৮ কুষ্টিয়া ৯ রাজমহল ১০ কিষণগঞ্জ। (খ) পূর্ববঙ্গ-আসাম: ১১ বাগ্রাকোট ১২ জলপাইগুড়ি, ১৩ রামপুর-বোয়ালিয়া ১৪ পিরোজপুর ১৫ টেকনাফ ১৬ শিলচর ১৭ শ্রীহট্ট ১৮ শিলং ১৯ ডিব্রুগড় ২০ ধুবড়ি কু কুচবিহার ত্রি ত্রিপুরা।

১৯০১ সালের আদমসুমারির ভিত্তিতে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল:

	বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
(ক) বাংলা	১,১৫,৮১৯	৫,০৭,২২,০৬৯	৪,২৫,৪০,৩৫৯	৯২,০৮,১৯৯
পশ্চিম বঙ্গ	৩১,৪৫১	১,৭২,৩৩,১০৪	হিন্দুপ্রধান	
বিহার	৪৩,৫২৪	২,৩৬,০৬,৩৯২	”	
ছোটনাগপুর	২৭,১০১	৪৯,০০,৪২৯	”	
উড়িষ্যা	১৩,৭৪৩	৪৯,৮২,১৪২	”	
কলকাতা	৩৪	১১,৯০,২৪৭	”	
হাওড়া	১০	১,৫৭,৫৯৪	”	
(খ) পূর্ব বঙ্গ-আসাম	৯৭,৫১০	৩,০৯,৬১,৪৫৯	১,১৬,৩৯ ৪৯১	১,৭৮,৬৮,৪৫২
পূর্ববঙ্গ	৪৫ ৯৫১	২,৫৬,৫৬,৩৪৯		মুসলিম প্রধান
আসাম	৫১,৫৫৯	৫,৩০৫		হিন্দুপ্রধান
কুচবিহার	১,৩১৮	৫,৬৬,৯৭৪		”
মণিপুর	৮,৬২০	২,৮৪,৪৬৫		”
ত্রিপুরা	৪.১১৬	১,৭৩,৩২৫		”
ঢাকা		৮৯,৭৩৩		”

বাংলা : ১৯১২



১৯০৫-এর বিভাগে বাংলা হয়েছিল খণ্ডিত, যুক্ত হল পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় ১৯১২ সালে। কিন্তু কয়েকটি বাংলাভাষী অঞ্চল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন প্রদেশে। সীমানা ও তথ্য বিচার করলেই বোঝা যায় এবার ব্রিটিশ শাসকের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষে জাতীয়তাবাদকে নির্জীব করে দেওয়া।

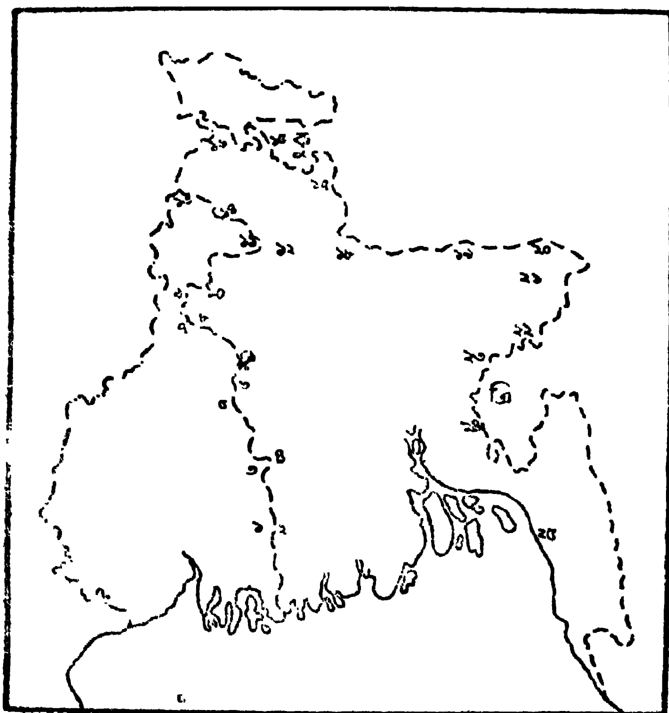
দশটি স্থানের দ্বারা সীমানা দেখানো হচ্ছে: ১ দার্জিলিং ২ খরবা ৩ নলহাটি ৪ রামপুরহাট ৫ সীতারামপুর ৬ দিঘা ৭ টেক্‌নাফ ৮ রাঙামাটি ৯ সুসং দুর্গাপুর ১০ দলসিংপাড়া কু কুচবিহার ত্রি ত্রিপুরা।

কলকাতা নিয়ে ২৮টি জেলা ছিল বাংলায়। সারা ভারতে তখন

বাংলাভাষীদের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি। ১৯১১র আদমসুমারির ভিত্তিতে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল :

	বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
বাংলা	৭৮,৬৯৯	৪,৫৪,৮৩,০৭৭	২,০৩,৮০,৭২০	২,৩৯,৮৯,৭১৯
দেশীয় রাজ্য	৫,৪৩৪	৮,২২,৫৬৫	৫,৬৭,৬৩৭	২,৪৭,৫০৯
কলকাতা	৩৪	১০,৪৩,৩০৭		হিন্দুপ্রধান
হাওড়া	১০	১,৭৯,০০৬		”
ঢাকা		১,০৮,৫৫১		”

বাংলা : ১৯৪৭



ভারতের স্বাধীনতালাভের সময়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনায় ও র‍্যাড্‌ক্লিফের বিচারে বাংলাকে ভাগ করা হল ১৯৪৭ সালে। এই বিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। এই বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গে উত্তরাংশের সঙ্গে দক্ষিণাংশের কোনো

প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না অর্থাৎ যোগ ছিল বিহারের মধ্য দিয়ে। পরে ভারত সরকার এই যোগ স্থাপন করেছেন বিহার থেকে খানিকটা বাংলাভাষী অঞ্চল দিয়ে। বর্তমানে কুচবিহার পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত হলেও ত্রিপুরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে।

(ক) পশ্চিমবঙ্গ : সমগ্র বর্ধমান বিভাগ (৬টি জেলা), ২৪ পরগণা, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং, নদীয়া (প্রায় অর্ধেক), যশোর (১১%), জলপাইগুড়ি (৭৮%), দিনাজপুর (৩৫%), মালদহ (৭০%)।

(খ) পূর্ব বঙ্গ : সমগ্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ (৮টি জেলা), রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, খুলনা এবং নদীয়া-যশোর-জলপাইগুড়ি-দিনাজপুর-মালদহ-শ্রীহট্টর অল্প-বিস্তর অংশ।

পশ্চিমবঙ্গের সীমানা : ১ হিংগুলগঞ্জ ৩ বনগাঁ ৫ তেহাটা ৭ লালগোলা ৯ গৌড় ১১ হিলি ১৩ বিন্দোলা ১৫ হলদিবাড়ি

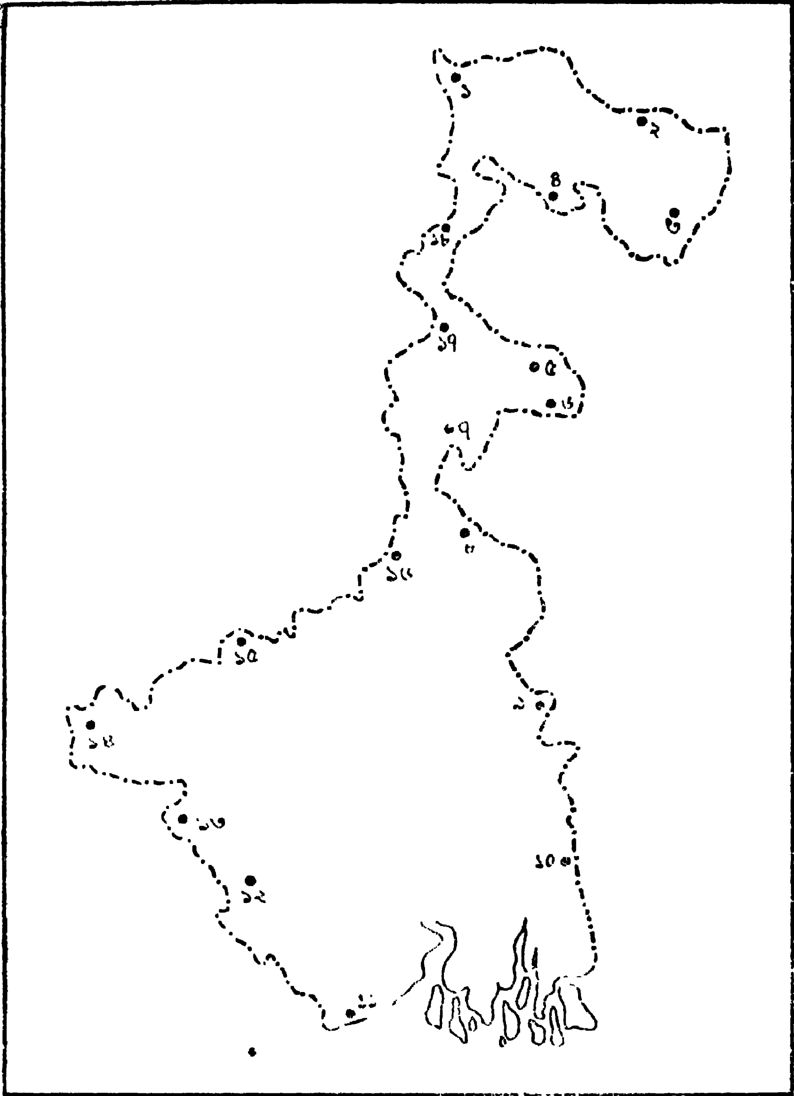
কু কুচবিহার ত্রি ত্রিপুরা।

পূর্ব বঙ্গের সীমানা : ২ কালিগঞ্জ ৪ অমৃত বাজার ৬ মেহেরপুর ৮ গোদাবাড়ি ১০ পার্বতীপুর ১২ ঘোড়াহাট ১৪ দিনাজপুর ১৬ পচাগড় ১৭ কুড়িগ্রাম ১৮ বাহাদুরাবাদ ঘাট ১৯ সুসং দুর্গাপুর ২০ জয়ন্তিয়াপুর ২১ শ্রীহট্ট ২২ কুলাউড়া ২৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৪ কুমিল্লা ২৫ চট্টগ্রাম।

১৯৪১এর আদমসুমারির ভিত্তিতে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল :

		বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
(ক)	পশ্চিমবঙ্গ	২৮,২১৫	২,১১,৯৬,৪৫৩	৬৭ ৬১	২৫,০১
	কুচবিহার	১,৩১৮	৬,৪০.৮৪২		হিন্দুপ্রধান
	ত্রিপুরা	৪,১১৬	৫,১৩,০১০		
	কলকাতা	৩৪	২৮,১৮,৪৪৫		
	হাওড়া	১০	৩,৭৯,২৯২		
(খ)	পূর্ব বঙ্গ	৫৩,৯০৯	৪,১৯,৪৯,৭১০	২৮ ৫	৭১
	ঢাকা		২,১৩,২১৮ হিন্দুপ্রধান (১৯৪১) মুসলিমপ্রধান (১৯৪৭)		

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ



বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের কিছু বাংলাভাষী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তিই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। সীমানা নির্দেশ করা হচ্ছে আঠারোটি স্থানের চিহ্ন দ্বারা :

১ দার্জিলিং ২ দলসিংপাড়া ৩ তুফানগঞ্জ ৪ হলদিবাড়ী

৫ কুমারগঞ্জ ৬ বালুরঘাট ৭ মালদহ ৮ লালগোলাঘাট ৯ বানপুর ১০ বসিরহাট ১১ দিঘা ১২ ঝাড়গ্রাম ১৩ বান্দোয়ান ১৪ ঝালদা ১৫ চিত্তরঞ্জন ১৬ নলহাটি ১৭ রায়গঞ্জ ১৮ ইসলামপুর।

সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য বাংলা ভাষায় রচিত তিরিশটি গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হল :

আলি, ওয়াজেদ	ভবিষ্যতের বাঙালী
গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ	উপনিবেশ
ঘোষ, বিনয়	বাঙলার নবজাগৃতি
	পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি
	সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার	জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য
ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ	বাংলার ব্রত
ঠাকুর টেকচাঁদ	আলালের ঘরের দুলাল
দাসগুপ্ত, শশিভূষণ	শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ
দে, সুশীলকুমার	বাংলা প্রবাদ
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন	মধ্যযুগের বাংলা
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ	সংবাদপত্রে সেকালের কথা
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস	বাংলার ইতিহাস
	ধর্মপাল
	ময়ূখ
বিশী, প্রমথনাথ	কেরী সাহেবের মুন্সী
ভট্টাচার্য, আশুতোষ	বাংলার লোকসাহিত্য
মজুমদার, রমেশচন্দ্র	বাংলা দেশের ইতিহাস
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল	বাংলা ও বাঙালী
	বিশাল বাংলা
রায়, নীহাররঞ্জন	বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ	প্রাচীন বাংলার গৌরব
শেঠ, হরিহর	পুরাতনী
সিংহ, কালীপ্রসন্ন	হুতোম প্যাঁচার নক্শা
সেন, ক্ষিতিমোহন	বাংলার সাধনা
সেন, দীনেশচন্দ্র	বৃহৎ বঙ্গ
সেন, সুকুমার	প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী
	মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী
হালদার, গোপাল	বাঙালী সংস্কৃতির রূপ

৪

নির্দেশিকা

শুধু মূল ঐতিহাসিক চরিত্র, সাহিত্যের চরিত্র, লেখক ও গ্রন্থ নিয়ে এই নির্দেশিকা রচিত হয়েছে



আমাদের প্রকাশনায় অন্যান্য গ্রন্থ-

॥ প্রবন্ধ ॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (২য় সংস্করণ) ... ১৬·০০

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল ... ৬·০০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের কথা ... ৬·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বাংলা কাব্য প্রবাহ ... ১০·০০

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু

নৈরাজ্যবাদ ... ১০·০০

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা ... ৬·০০

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক-মানস ... ৬·০০

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ... ৫·০০

শচীন্দ্র মজুমদার

বিবাহ-সাধনা (২য় সংস্করণ) ... ৩.৫০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন ... ৬·০০

অলডাস হাক্সলি/দেবব্রত রেজ

সাহিত্য ও বিজ্ঞান ... ৫·০০

আইনস্টাইন/শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন-জিজ্ঞাসা (২য় সংস্করণ) ... ১০·০০

উৎপল দত্ত

চায়ের ধোঁয়া ... ৬·০০

বারট্রাণ্ড রাসেল/পরিমল গোস্বামী

সুখের সন্ধানে (২য় সংস্করণ) ... ৬·৭৫

॥ উপন্যাস ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রাচীর ও প্রান্তর ... ৬·০০

অজিতকৃষ্ণ বসু

শেষ বসন্ত ... ৪·০০

শেষ বসন্ত (পেপার-ব্যাক) ... ১·৫০

আশাপূর্ণা দেবী

অন্য মাটি অন্য রং ... ৬·৫০

লঘু-ত্রিপদী ... ৪·০০

শুধু তারা দুজন ... ৬·০০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একই বৃন্ত ... ৬·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি

হিরণ্যগড়ের বধূ ... ৫·০০

জ্যোতির্ময়ী দেবী

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ... ৪·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র রায়

প্রণয় এক প্রাণ-শিল্প ... ৬.০০

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

বিহঙ্গের গান ... ৮·০০

তারাপদ রাহা

আরব্য রজনী (১ম খণ্ড) ... ৫·০০

দিলীপকুমার রায়

অঘটনের শোভাযাত্রা (একত্রে তিনটি উপন্যাস) ... ১০·০০

দীপক চৌধুরী

এক যে ছিল রাজা ... ৫·০০

নির্মলা দেবী

স্বপ্ন মধুর ... ৩·৫০

॥ উপন্যাস ॥

দেবব্রত রেজ

প্রাণ-পাথেয়	...	৭'৫০
স্বপ্নলোকের চাবি	...	৩'৫০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

আজও তারা ডাকে	...	৩'৫০
এখানে মৃত্যুর হাওয়া	...	৪'০০
এখানে মৃত্যুর হাওয়া (পেপার-ব্যাক)	...	১.৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অন্য এক নাম	...	৪'০০

বাণী রায়

চক্ষে আমার তৃষ্ণা	...	৬'০০

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

নতুন জনপদ	...	৬'০০
নিঃসঙ্গ নায়ক	...	৩'০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্বেতচন্দন তিলকে	...	৩'৫০

সমরেশ বসু

যৌবন	...	৫'৫০

সুধাংশু ঘোষ

ফানুসের উপমা	...	৩'০০

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর মেলেনি	...	৩'৫০

আলব্যার কাম্যু/পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পতন	...	৪'০০

আলব্যার কাম্যু/প্রেমেন্দ্র মিত্র

অচেনা (২য় সংস্করণ)	...	৫'০০

॥ উপন্যাস ॥

আলবার্তো মোরাভিয়া/চিত্তরঞ্জন মাইতি

দাম্পত্য-প্রেম ... ৪'০০

আলেকজান্ডার লারনেট-হলেনিয়া

বাণী রায়

মোনা লিসা ... ২'৫০

ওসামু দাজাই/কল্পনা রায়

অস্তগামী সূর্য ... ৪'৫০

টমাস মান/সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুর আমি নারী ... ৩'০০

দস্তয়েভ্স্কি/দেবব্রত রেজ

বাড়ীউলি ... ৪'০০

দস্তয়েভ্স্কি/সমরেশ খাসনবিশ

সম্পাদনা : গোপাল হালদার

অপমানিত ও লাঞ্ছিত ... ৮'০০

বরিস পাস্টেরনাক/দীপক চৌধুরী

ডাক্তার জিভাগো (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত) ... ১২'৫০

বাণভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

কাদম্বরী (২য় সংস্করণ) ... ১৪'০০

মপাসাঁ/অরুণ চক্রবর্তী ও

গীতা গুহরায়

পঙ্ক থেকে পঙ্কজ ... ৩'৫০

স্তেফান জোয়াইগ/দীপক চৌধুরী

উত্তরণ * উন্মত্ত * ত্রয়ী প্রতিটি ৩'০০

হেনরি জেম্‌স্‌/অ. কৃ. ব.

প্রেম এক মন্ত্র ... ৮'৫০

হেরমান হেস/শিউলি মজুমদার

অমৃত-আলোতে .. ৬'০০

॥ গল্প সংগ্রহ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বরবর্ণিনী ... ৩·০০

আভা পাকড়াশী

বসন্ত বৌরী ... ৩·৫০

চিত্তরঞ্জন মাইতি

অনেক বসন্ত দুটি মন ... ৩·৫০

কারেল চাপেক/মোহনলাল ও মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়

নীল চন্দ্রমল্লিকা (চেক গল্প) ... ৪·০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চীনা মাটি (চীনা গল্প) ... ৬·০০

বারট্রাণ্ড রাসেল/অজিতকৃষ্ণ বসু

শহরতলির শয়তান ... ৪·৫০

স্তেফান জ্বোয়াইগ/দীপক চৌধুরী

গল্প সংগ্রহ (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) প্রতি খণ্ড ৫·০০

॥ চরিত্র চিত্রণ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নারী রহস্যময়ী ... ৫·০০

॥ জীবনী ॥

সল কে. প্যাডোভার/অ. কৃ. ব.

দ্বাদশ সূর্য ... ৪·৫০

॥ ভ্রমণ কাহিনী ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি

শৈলপুরী কুমায়ুন (৩য় সংস্করণ) ... ৫·০০

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইরাবতী থেকে নায়েগ্রা ... ৬·০০

॥ রম্য রচনা ॥

এক কলমী (পরিমল গোস্বামী)

ইতস্ততঃ ... ৬·০০

॥ স্মৃতিকথা ॥

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চলমান জীবন (২য় পর্ব) ... ৭·০০

মহাদেবী বর্মা/মলিনা রায়

ছায়াময় অতীত ... ৪·০০

মৈত্রেয়ী দেবী

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ... ১০·০০

॥ যাদু-কথা ॥

অজিতকৃষ্ণ বসু

যাদু-কাহিনী (যাদুকর ও যাদুবিদ্যার বিচিত্র কথা। নরসিংদাস পুরস্কার প্রাপ্ত) ... ৮·০০

॥ কবিতা ॥

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

মজুত ... ২·০০

একটি ধানের শীষের উপরে (জাপানী কবিতা) ... ২·৫০

॥ কাব্য-নাটিকা ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বসন্ত-বিলাপ ... ৪·০০

॥ নাটিকা ॥

গোপীনাথ নন্দী

জনতার কোলাহল ... ২·৫০

সন্ন্যাসীর গীত ... ·৭৫

॥ কিশোর সাহিত্য ॥

অন্নু বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুরূপী গান্ধী (সচিত্র চরিত্র চিত্রণ) ... ৬.০০

অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর (শিল্পগুরুর জীবন কথা) ... ৩.০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

গড় জঙ্গলের কাহিনী (উপন্যাস) ... ৩.৫০

তারাপদ রাহা

আরব্য রজনী (১ম খণ্ড/উপন্যাস) ৫.০০

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অমর জহর (ছন্দে গাঁথা জহরলালের জীবনী) ... ১.০০

মাটির মানুষ লালবাহাদুর

(ছন্দে গাঁথা লালবাহাদুরের জীবনী) ... ১.০০

পরিচয় গুপ্ত

আষাঢ়ে ভূতের গল্প (গল্প-সংগ্রহ) ... ৪.০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার (উপন্যাস) ... ৪.৫০

বোর্ডিং ইস্কুল (উপন্যাস) ... ৩.০০

এন. কারাজিন/সরিৎশেখর মজুমদার

উড়ে চলি দক্ষিণে (সারসদের বিচিত্র অভিযান কাহিনী) ৩.৭৫

লরিন জিলিয়াকাস/পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাকের কথা (ভারতীয় অংশযুক্ত ডাক-ব্যবস্থার ইতিকথা) ৪.০০

সোলি পাভরি ও রসিক শাহ/শ্রীমতী সন্ধ্যা দেবী

সত্যই, সব কিছুই ভূ-কেন্দ্রগামী

রসিক শাহ/শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বানর থেকে নর ? ... ১.৮০

সোলি পাভরি/শ্রীমতী সন্ধ্যা দেবী

আমাদের জুড়ে জুড়ে বন্ধু আর শত্রুর দল